বঙ্গবিজেতা।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

সপ্তম সংস্করণ

এলম্ প্রেস : কলিকাতা।
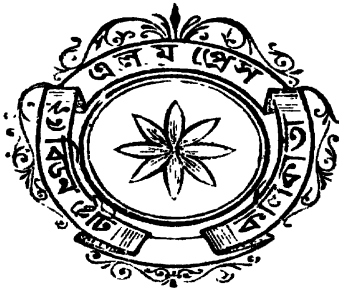
উপহার।

মদীয়

বিদ্যালয়ে সহাধ্যায়ী,

বিদেশ-ভ্রমণে চির-সহচর,

জীবনের বন্ধু

শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত

মহানুভবকে

এই প্রণয় উপহার

প্রদান করিলাম।

বনগ্রাম।
১২৮০ বঙ্গাব্দ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।
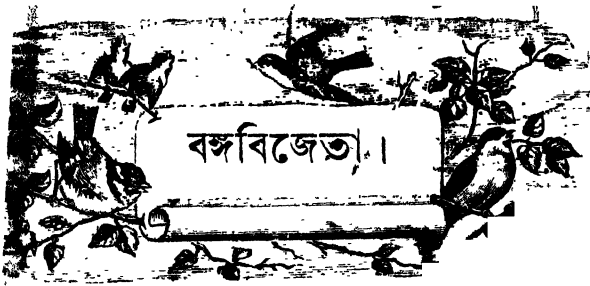
প্রথম পরিচ্ছেদ

রুদ্রপুরে আগমন।

WHILE the ploughman near at hand
Whistles o'er the furrowed land,
And the milkmaid singeth blithe,
And the mower whets his scythe,
And every shepherd tells his tale
Under the hawthorn in the dale.

Milton.

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার দেশে হিন্দুরাজ্য বিলুপ্ত হইল। সেই অবধি ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৩৭০ বৎসর, আফগান অথবা পাঠানেরা এই দেশে রাজত্ব করেন। ইঁহারা কখন দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন, কখন বা সময় পাইলে স্বাধীনভাব অবলম্বন করিতেন। ইঁহাদিগের রাজ্যতন্ত্র অনেকাংশে ইউরোপীয় ফিউডল রাজ্যতন্ত্রের সদৃশ ছিল। দেশের সিংহাসন শূন্য হইলেই কখন কখন রাজপুত্রই রাজা হইতেন, এবং কখন বা কোন সৈনাপতি আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। দেশের অধিপতি কোন একটী উৎকৃষ্ট

জেলা আপন অধীনে রাখিতেন, অন্যান্য জেলা প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ নিজ নিজ অধিকারে রাখিতেন। তাঁহারা আবার আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে জমী বিভাগ করিয়া দিতেন। সেনাপতিগণ কখন কখন বঙ্গাধিপতির অধীনতা স্বীকার করিতেন, আবার সুযোগ পাইলেই আপন আপন জেলায় স্বাধীনভাব অবলম্বন করিতেন।

পাঠানদিগের শাসনাধীনে হিন্দুজমীদারদিগের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছিল। এমন কি, বঙ্গদেশের পাঠান রাজাদিগের মধ্যে আমরা একজন হিন্দুরাজারও নাম দেখিতে পাই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গণেশ রাজা বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়া সাত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করেন। তিনি পূর্ব্বে জমীদার ছিলেন, আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং তাঁহার বংশ সর্ব্বশুদ্ধ চত্বারিংশৎ বৎসর বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন।

মোগলগণ যখন বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন হিন্দু জমীদারদিগের আট লক্ষ পদাতিক ও তেইশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং চারি সহস্র রণতরি ছিল। জমীদারগণ প্রায়ই জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, এবং প্রকৃত পক্ষে দেশের রাজা ছিলেন। দেশের কৃষক ও প্রজাগণ সম্পূর্ণরূপে জমীদারদিগের অধীন থাকিত। প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, দস্যু ও দুশ্চরিত্র লোকদিগকে তাঁহারাই দণ্ড দিতেন, তাঁহারাই গ্রামে গ্রামে শান্তিরক্ষা করিতেন, তাঁহারাই প্রজাগণের "বাপ মা" ছিলেন। ফলতঃ জমীদারেরাই প্রজাদিগের পালনকর্ত্তা ও বিচারপতি

ছিলেন, তাঁহারাই প্রজাদিগের রক্ষক ও রাজা ছিলেন। এইরূপে পাঠানদিগের অধীনে দেশে হিন্দুশাসন প্রবল ছিল।

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁ বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার পরবৎসরেই আকবর শাহ এই দেশ জয় করিবার অভিলাষ করেন। তিনি স্বয়ং পাটনা নগর অধিকার করিয়া মনাইম খাঁকে সেনাপতি রাখিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। মনাইম খাঁ নামমাত্র সেনাপতি ছিলেন; ক্ষত্রিয়চূড়ামণি রাজা টোডরমল্লই বস্তুতঃ পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করেন। তিনিই দায়ুদ খাঁকে বার বার পরাস্ত করিয়া অবশেষে কটকের মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাহাতে দায়ুদ খাঁ ভীত হইয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহারদেশ মোগলদিগকে অর্পণ করিয়া কেবল মাত্র উড়িষ্যা প্রদেশ আপন অধীনে রাখিলেন। এই সন্ধির পরই টোডরমল্ল দিল্লী যাত্রা করেন, এবং দায়ুদ খাঁ অবকাশ পাইয়া সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর শাহ হোসেন কুলীখাঁকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন; তিনি নামমাত্র সেনাপতি; রাজা টোডরমল্লই সর্ব্বে সর্ব্বা। টোডরমল্ল দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে আসিয়া রাজমহলের মহাযুদ্ধে দায়ুদ খাঁকে পরাস্ত করেন, এবং সেই যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ নিহত হয়েন। দিল্লীশ্বর হোসেন কুলীখাঁকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, এবং টোডরমল্ল পুনরায় দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইল; এবার দেশে নব আগন্তুক মোগল সেনাপতি ও জায়গীরদারগণই বিদ্রোহী

হইলেন। আকবর শাহ অতিশয় বুদ্ধিমান সম্রাট্ ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে হিন্দুসেনাপতি দুইবার পাঠান শত্রু-দিগকে জয় করিয়াছেন, সেই হিন্দু সেনাপতি ভিন্ন আর কেহই দেশীয় হিন্দুদিগের সাহায্য লইয়া মোগল বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সুতরাং ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে টোডর-মল্ল সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীরপুরুষ তৃতীয়বার বঙ্গ-দেশ জয় করিয়া দুই বৎসরকাল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে। এই আখ্যায়িকায় ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা লিখিত হইবে, সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমীদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলদিগের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

একদিন প্রাতঃকালে একজন ব্রহ্মচারী নদীয়া জেলার অন্তঃ-পাতী ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ রুদ্রপুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামাভি-মুখে গমন করিতেছিলেন। চারিদিকে কেবল বিস্তীর্ণ শস্য-ক্ষেত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে; প্রভাতবায়ু রহিয়া রহিয়া শস্যক্ষেত্রের উপর খেলা করিতেছে; শস্য আনন্দে যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। বহুদূরে প্রান্তরসীমায় দুই একটী পল্লীগ্রাম দেখা যাইতেছে; কুটীরাবলী দেখা যায় না, কেবল নিবিড় হরিৎবর্ণ বৃক্ষাবলি নয়নগোচর হইতেছে। আকাশ অতি নীল, পক্ষী সকল গান করিতেছে, এবং কৃষক-গণও পল্লীগ্রাম হইতে আসিতে আসিতে মনের উল্লাসে গান করিতেছে। ব্রহ্মচারী যাইতে যাইতে একজন লোককে

জিজ্ঞাসা করিলেন—রুদ্রপুর আর কতদূর? সে উত্তর করিল—অধিক দূর নাই, প্রায় আধ ক্রোশ হইবে।

ব্রহ্মচারী যাহার সহিত কথা কহিলেন, তাহার বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছে; সে জাতিতে কৈবর্ত্ত, কিন্তু বেশভূষা ভদ্রোচিত। সে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, রুদ্রপুরে যাইতেছেন? আমি তথাকার লোক; চলুন, একত্রে যাই, আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—আমার নাম শিখণ্ডবাহন, ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ মহেশ্বরমন্দির হইতে আসিতেছি। তোমার নাম কি?

নবীন। আমার নাম নবীন দাস; এই স্থানে আমার কিছু জমী আছে, সেইজন্য আমি আসিয়াছিলাম।

শিখণ্ড। এবার শস্য কেমন হইয়াছে?

নবীন। ঠাকুর, আমার দুই কুড়ি বৎসর পার হইয়াছে, এমন সুন্দর শস্য কখন দেখি নাই। এ বৎসর বিধাতার অনুগ্রহের সীমা নাই।

ক্ষণেক পর নবীন দাস আবার বলিতে লাগিল—ঠাকুর, আমাদের জমীদারপুত্রের কি হইয়াছে, শুনিয়াছেন?

শিখণ্ডি। না; কি হইয়াছে?

নবীন। তিনি এক প্রকার উন্মত্তের মত হইয়াছেন, কারণ কেহ জানে না। তাঁহার পিতা তাঁহার আরোগ্যের জন্য কত যত্ন করিলেন, কোন ফল হইল না। আপনি ঠাকুর লেখাপড়া জানেন, আপনি কিছু স্থির করিতে পারেন?

শিখণ্ডি। শাস্ত্রে উন্মত্ততার অনেক কারণ নির্দ্দেশ করে—বন্ধুর বিয়োগ, রমণীর প্রেম—

নবীন। না, সেরূপ নহে; আমাদের জমীদারপুত্র কত প্রকার বিহ্বল কথা বলেন, কিছু ঠিকানা থাকে না। বোধ হয়, অনেক লেখা পড়া শিখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন।

শিখণ্ডি। কি বলেন বলিতে পার?

নবীন। শুনিয়াছি, আমাদের জমীদারপুত্র কখন কখন বলেন, বৈরনির্যাতনে পরম সুখ; কখন বলেন, স্ত্রীরত্ন পরম রত্ন; কখন বলেন, বন্ধুহত্যার মত পাপ নাই; আবার কখন বলেন, প্রজার কষ্ট দেখা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।

শিখণ্ডিবাহন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—আমার বোধ হয়, তিনি কোন ভয়ানক পাপ করিয়া থাকিবেন, মহাপাপে চিত্তের উন্মত্ততা জন্মে।

নবীন। তিনি কোন পাপ করিবেন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।

এই বলিয়া নবীন দাস ক্ষণেক স্থির হইয়া যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে লাগিল। পুনরায় বলিল—তাঁহার অন্তঃকরণে যে দয়া, তিনি পাপ করিতে পারেন না। আজ অনুমান দ্বাদশ বৎসর হইল, আমি একবার ইচ্ছাপুর গিয়াছিলাম, দেখিলাম দুই চারিজন প্রজা খাজানা দিতে পারে নাই বলিয়া ঘরে আবদ্ধ আছে। তখন আমাদের জমীদারপুত্রের বয়স আট বৎসর হইবে। তিনি লুকাইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং প্রজাগণের হস্তে দুইটা করিয়া মুদ্রা দিলেন। প্রজারা আনন্দে খাজানা দিয়া চলিয়া গেল।

শিখণ্ডি। তাহার পর?

নবীন। তাহার পর প্রজারা হঠাৎ কেন খাজানা দিল,

মুদ্রাই বা কোথা হইতে পাইল, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে প্রজারা গৃহে ফিরিয়া গেলে পর বালক অতি ভয়ে ভয়ে পিতার নিকট আপন কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। তাঁহার পিতা নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। আমি দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলাম; আমার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে দুইজনই রুদ্রপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। নানাপ্রকার বৃহদাকার বৃক্ষে গ্রাম আচ্ছাদিত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সূর্য্যরশ্মি পত্রের ভিতর দিয়া শুষ্কপত্ররাশি ও গ্রাম্য পথের উপর পতিত হইতেছে। ডালে ডালে নানাপ্রকার সুন্দর পক্ষী গান করিতেছে, কোকিল, শ্যামা, দোয়েল, ফিঙ্গা, পাপিয়া, ঘুঘু, সকলেই নিজ নিজ রবে মনের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য সরোবরে পদ্ম ও শালুকফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে বৃক্ষতলে দুই একটা কুটীর দেখা যাইতেছে, স্থানে স্থানে দুই একজন কৃষক গান করিতে করিতে মাঠে যাইতেছে, তাহাদের গৃহিণীগণ মৃন্ময়-কলস কক্ষে লইয়া হেলিয়া দুলিয়া জল আনিতে যাইতেছে।

শিখণ্ডিবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশ্বেতা নামে এক বিধবা এই গ্রামে বাস করেন, তাঁহার নিবাস কোথা?

নবীন দাস উত্তর করিল—চলুন, আমি দেখাইয়া দিতেছি। অনন্তর কিছু পথ লইয়া গিয়া নবীন মহাশ্বেতার ঘর দেখাইয়া দিল। শিখণ্ডিবাহন মহাশ্বেতার ঘরে অতিথি হইলেন, নবীন দাস ব্রহ্মচারীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিদায় লইয়া আপন কুটীরে আগমন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রতাবলম্বিনী।

She stole along, she nothing spoke,
The sighs she heaved were soft and low,
And naught was green upon the oak,
But moss and rarest mistletoe:
She kneels beneath the huge oak tree,
And in silence prayeth she.

Coleridge.

রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। আজি শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী; কিন্তু মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন; ক্ষেত্র, গ্রাম, অটবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। খদ্যোৎমালা বৃক্ষলতাদির নিবিড় অন্ধকার রঞ্জিত করিতেছে। ইচ্ছামতী নদী বিপুলকায়া হইয়া তরঙ্গমালায় প্রবাহিত হইতেছে ও সেই তরঙ্গমালা নিশাবায়ু-বেগে অধিকতর উচ্ছ্বাসিত হইতেছে। নিবিড় নিকুঞ্জবনের ভিতর দিয়া স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু প্রধাবিত হইতেছে, বায়ুর শব্দ ও তরঙ্গের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হইতেছে না। সমগ্র জগৎ সুপ্ত।

এই প্রকার গভীর অন্ধকারে, এই শীতবায়ুতে একাকিনী কোন্ শুভ্রবসনা নদীজলে অবগাহন করিতেছেন? ইনি ব্রতাবলম্বিনী! অন্ধকারে ইঁহার শুভ্র বসন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। স্নানানন্তর তিনি বনপুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন, পরে নিকটবর্ত্তী এক পুরাতন বটবৃক্ষতলে এক শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া কবাট রুদ্ধ করিলেন।

মন্দিরের ভিতর একটী অল্পায়ত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি ও একটী প্রদীপ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; সেই প্রদীপের জ্যোতিঃ রমণীর অবয়বে ও শুভ্র বসনে পতিত হইতে লাগিল। রমণী অনেককাল যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন; বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষের অধিক হইবে, শীর্ণ কলেবর ও দুই একটী শুভ্র কেশ দেখিলে হঠাৎ পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক বোধ হয়! শরীর শীর্ণ, দীর্ঘায়ত, অথচ কোমলতাশূন্য নহে। ললাট উচ্চ ও প্রশস্ত, কিন্তু চিন্তারেখায় গভীরাঙ্কিত। গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত-কৃষ্ণ কেশরাশি কপোলে, হৃদয়ে ও গণ্ডে লম্বিত রহিয়াছে। নয়নে যে সমুজ্জ্বলতা, তাহা প্রায় নবীনার নয়নেও দেখা যায় না, কিন্তু সে যৌবনের সমুজ্জ্বলতা নহে, হৃদয়ের চিন্তাগ্নি যেন নয়ন দিয়া বিস্ফুলিঙ্গরূপে বহির্গত হইতেছে। ওষ্ঠ অতি সুচিক্কণ অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপ্রকাশক। সমস্ত শরীর গম্ভীর ও উন্নত, ও বিধবার শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হইয়া অধিকতর গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে। রমণী পুষ্প সকল শিবমূর্ত্তির সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।

তিনি অনেকক্ষণ উপাসনা করিতে লাগিলেন। বায়ু ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কবাট ঝন্ ঝন্ করিয়া

উঠিতে লাগিল, প্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়, কিন্তু রমণীর মুখমণ্ডলের স্থিরভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। স্থিরভাবে, মুদিত নয়নে, নিষ্পন্দশরীরে, প্রায় এক প্রহর কাল আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কি কামনা, তিনি কি বিষয়ে আরধনা করিলেন, আমরা অনুভব করিতে সাহস করি না।

উপাসনা সাঙ্গ হইলে রমণী প্রদীপ লইয়া বহির্গত হইবার জন্য কবাট খুলিলেন। খুলিবামাত্র বাতাসে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। সেই অন্ধকার নিশীথসময়ে ক্ষীণাঙ্গী প্রবল বায়ুবেগে কিঞ্চিন্মাত্র কাতর না হইয়া ধীরে ধীরে রুদ্রপুরের গ্রাম্য পথ দিয়া কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথ অতি সঙ্কীর্ণ; উভয় পার্শ্বে কেবল জঙ্গল, ও তাহার পার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষ সমূহের পত্ররাশি দ্বারা অন্ধকার দ্বিগুণ নিবিড় বোধ হইতেছে। সেই বৃক্ষতলে স্থানে স্থানে এক একটা কুটীর দেখা যাইতেছে; কুটীরবাসীগণ সকলেই সুপ্ত; জীবজন্তুর শব্দমাত্র নাই। এই প্রকারে মহাশ্বেতা কতক পথ অতিবাহিত করিয়া অবশেষে এক কুটীরে উপস্থিত হইয়া কবাটে আঘাত করিলেন। দ্বার ভিতর হইতে উদ্ঘাটিত হইল; মহাশ্বেতা প্রবেশ করিলে ভিতরে প্রদীপহস্তে এক অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিল।

মহাশ্বেতা কি চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিলেন; অল্প বয়স্কার মুখ দেখিবামাত্র সহসা সকল চিন্তা দূর হইল ও পবিত্র স্নেহভাব বদনমণ্ডলে বিকাশ পাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—সরলা, এত রাত্রি হয়েছে, তুমি এখনও জেগে আছ; যাও মা, শোও গে যাও। এই বলিয়া সস্নেহে সরলাকে আলিঙ্গন

করিলেন। সরলা উত্তর করিল—রাত্রি অধিক হইয়াছে, তা মা আমি জানিতাম না; ব্রহ্মচারী ঠাকুর মহাভারতের কথা বলিতেছিলেন, তাহাই শুনিতেছিলাম। আমার বোধ হয়, মহাভারতের কথা শুনিলে আমি সমস্ত রাত্রি জাগিতে পারি।

সরলা প্রদীপ লইয়া যখন শয়নগৃহে যাইতেছিল, তাহার মাতা অনিমেষলোচনে অনেকক্ষণ তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও অর্দ্ধস্ফুটবচনে বলিলেন—তুমি আমার সর্ব্বস্ব, বিধাতা কি বনশোভার নিমিত্ত এই অমূল্য রত্ন, এই অতুল্য পুষ্প সৃজন করিয়াছিলেন? বলিতে বলিতে যে ঘরে ব্রহ্মচারী ছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

সরলা শয়নগৃহে যাইয়া প্রদীপ রাখিল। মাতা শয়ন করিতে আসিবেন বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল না, প্রদীপও নিবাইল না। তাহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ হইবে, এখনও যৌবন সম্যক্‌রূপে আবির্ভূত হয় নাই, মুখ দেখিলে এখনও বালিকা বলিয়া বোধ হয়। অবয়ব বা মুখে বিশেষ রূপের ছটা বা লাবণ্য ছিল না; কবিগণ যেরূপ তন্বঙ্গী রূপসীদিগের বর্ণনা করিতে ভালবাসেন, আমাদের সরলার সে অপরূপ সৌন্দর্য্যের কিছুই ছিল না। তবে শরীর কোমলতাপূর্ণ ও মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় মধুরিমা ও সরলতা বিরাজমান রহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন বালিকাহৃদয়ে কেবল সুশীলতা, সরলতা ও মানব-সাধারণের প্রতি পবিত্র প্রেম এবং স্নেহরাশি বিরাজ করিতেছে। বিশেষ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার মাতার মত নয়ন দুটী সমুজ্জ্বল; সমুজ্জ্বল, কিন্তু শান্ত, সরল ও কোমলতাপূর্ণ। ওষ্ঠদ্বয় বিশেষ সুচিক্কণ নহে, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, মিষ্টতার আধার, আর

সদা সুহাসিতে বিকসিত। গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ বদনমণ্ডলের সরল কিশোর ভাব অধিকতর বর্দ্ধন করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ কোমল ও সুস্নিগ্ধ। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর শয্যায় শয়ন করিতে না করিতে নিদ্রার আবির্ভাব হইল, প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন পুনরায় মুকুলিত হইয়া কোরকভাব ধারণ করিল।

যে কুটীরে মাতা ও কন্যা বাস করিতেন, সে কুটীর অতিশয় সামান্য। ক্ষুদ্র একটী পাকশালা ও একটী গো-শালা ছিল, এতদ্ভিন্ন দুইটী বড় ঘর ছিল, তাহার মধ্যে একটীতে মাতা ও কন্যা ও একমাত্র দাসী শয়ন করিত, ও অপরটীতে দিনের বেলা কর্ম্ম কার্য্য হইত, ও কোন অতিথি আসিলে তাঁহার শয্যা রচনা হইত। গোশালায় দুই তিনটী গাভী থাকিত; প্রাঙ্গণে একটী গোলা ছিল, তাহাতে কিছু ধান্য সঞ্চিত থাকিত। গৃহপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়ত বাগান ছিল, তাহাতে কতকগুলি ফলবৃক্ষ ছিল ও সরলা কতকগুলি পুষ্পের চারা রোপণ করিয়াছিল। যদিও কুটীর সামান্য, তথাপি কোন আগন্তুক আসিলেই অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিতেন যে, কুটীরবাসিনীগণ নিতান্ত সামান্য লোক নহেন। গৃহের মধ্যে সকল দ্রব্যই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বসন যৎসামান্য, কিন্তু পরিচ্ছন্ন; ঘরগুলিও যৎসামান্য, কিন্তু পরিষ্কৃত; প্রাঙ্গণে তৃণমাত্র নাই। কুটীরবাসিনী কায়স্থরমণীদিগের আচারব্যবহার দেখিয়া প্রথমে গ্রামবাসীগণ নানাপ্রকার আলোচনা করিত। এক্ষণে ছয় সাত বৎসরাবধি তাঁহাদিগকে সেই গ্রামে বাস করিতে দেখিয়া সকলেই নূতন অনুভবে বিরত হইল; সকলেই সিদ্ধান্ত করিল যে, মহাশ্বেতা কোন কায়স্থ

জমাদারের বিধবা হইবেন, বিষয় সম্পত্তি হারাইয়া, ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া, কন্যাকে লইয়া এই গ্রামে আশ্রয় লইয়াছেন।

এদিকে মহাশ্বেতা বহু সম্মান করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্মচারীকে আহার করাইয়া আপনিও কিছু জলযোগ করিলেন। পরে ব্রহ্মচারীকে আসনে উপবেশন করাইয়া আপনি ভূমিতে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইতে লাগিল, আমরা তাহার কিয়দংশ বিবৃত করিব।

শিখণ্ডিবাহন বলিলেন—ভগিনী, আমি পিতা চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সম্প্রতি তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আজি সাত বৎসর হইল, পিতা তীর্থে গিয়াছিলেন, সাত বৎসরে হিমালয় হইতে কাবেরী-তীর পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন।

মহাশ্বেতা। পিতার সার্থক জীবন।

শিখণ্ডি। অবশেষে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই শুনিলেন যে, পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে, দিল্লীশ্বরের হিন্দুসেনাপতি টোডরমল্ল এ দেশ জয় করিয়াছেন। আরও শুনিলেন যে বঙ্গদেশের জমীদারকুলতিলক সমরসিংহের কাল হইয়াছে। পরে আমার প্রমুখাৎ তোমার ব্রতের বিষয় শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ব্রতের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, এ ব্রত হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। ভগিনী এখনও ক্ষান্ত হও।

মহাশ্বেতা বলিলেন—ভ্রাতঃ, এ অনুরোধ হইতে আমাকে মার্জ্জনা করুন। এ ব্রত আমার প্রাণের অংশ স্বরূপ ও

জীবনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছে। এত শোক, এত মনস্তাপ সহ্য করিয়া যে আমি জীবিত আছি, এই ভয়ানক অবস্থার পরিবর্ত্তনেও যে আমি স্বচ্ছন্দে আছি, সে কেবল এই ব্রতের নিমিত্ত। যে দিন ব্রত উদ্যাপন করিব, সে দিন আমাকে জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এই উত্তর শ্রবণ করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রতত্যাগের অনুরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন। ক্ষণেকপর বলিলেন—বৈরনির্য্যাতনের কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেছ?

মহাশ্বেতা বলিলেন—আমি এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট একটী ভীষণ মন্ত্র লইয়াছি। তিনি এই মন্ত্র সাধনের জন্য যে অনুষ্ঠান বলিয়া দিয়াছেন তাহাও ভীষণ, কিন্তু সে অনুষ্ঠানে আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় স্নান করিয়া নিশা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সেই মন্ত্রদ্বারা দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করিব—যতদিন মহাদেব শক্রনিপাত না করেন, ততদিন কন্যা অবিবাহিতা থাকিবে—সপ্তমবর্ষের মধ্যে শক্রনিপাত না হইলে কুমারী কন্যাকে মহাদেবের নিকট হত্যা দিয়া চিতারোহণ করিব।

অনেকক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ব্রহ্মচারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমার ব্রত কি, তাহা আমি অবগত আছি। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বৈরনির্য্যাতন সাধনের জন্য এই ব্রতধারণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছ?

মহাশ্বেতা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—যিনি এই বিপুল সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা লাভ ভিন্ন স্ত্রীলোকে আর কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে?

সরলস্বভাব ব্রহ্মচারী মহাশ্বেতাকে ব্রত হইতে নিরস্ত করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন। মহাশ্বেতা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—আপনি পূর্ব্বকথা সকল জানিলে এ প্রকার অনুরোধ করিতেন না, আমি নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন, আর মহাত্মা চন্দ্রশেখরকেও এই সকল কথা জানাইবেন।

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে করিতে মহাশ্বেতার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল বিকৃতভাব ধারণ করিল, উজ্জ্বল চক্ষু আরও ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। প্রদীপ ক্ষীণ জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছে; ঘরের চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার; বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতেছে ও মহাশ্বেতার সামান্য কুটীরে বেগে আঘাত করিতেছে; কিন্তু স্মৃতিজাত প্রবল চিন্তাবায়ু তদপেক্ষা শতগুণ বেগে মহাশ্বেতার হৃদয়কন্দরে আঘাত করিতেছিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মহাশ্বেতা বলিলেন—আমি পাপীয়সী বটি; যে পরের অমঙ্গলের জন্য সপ্তবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রতধারণ করিয়া থাকিতে পারে, সে পাপীয়সী নহে ত কি? কিন্তু সামান্য অত্যাচারে আমি পাপব্রত অবলম্বন করি নাই। শ্রবণ করুন।

সরলচিত্ত শিখণ্ডিবাহন অগত্যা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রতাবলম্বিনীর পূর্ব্বকথা।

But o'er her warrior's bloody bier
The lady dropped nor flower nor tear.
Vengeance deep brooding on the slain
Had locked the source of softer woe,
And burning pride and high disdain
Forbade the rising tear to flow.

Scott.

আমার স্বামী রাজা সমরসিংহ রায় কায়স্থকুলের ভূষণ ছিলেন, এবং কায়স্থ জমীদারদিগের শিরোরত্ন ছিলেন। পাঠান দায়ুদ খাঁর সহিত যৎকালে মোগলদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সম্রাট্ আক্‌বর স্বয়ং যে সময় পাটনা নগর বেষ্টন করেন ও গঙ্গার অপর পারস্থ হাজীপুর নগর অধিকার করিবার অভিলাষ করিয়া আলমখাঁকে প্রেরণ করেন, আমার স্বামী একসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তিনিই সেই নগর হস্তগত করিবার প্রধান কারণ ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দিল্লীশ্বর এত তুষ্ট হইলেন যে, কিছুদিন পরে পাটনা হস্তগত করিয়া পাটনার দরবারে সমস্ত হিন্দু জমীদারদিগের মধ্যে আমার

প্রভুকেই প্রথম স্থান প্রদান করিলেন! তাহার অনতিবিলম্বেই সাগর-তরঙ্গের ন্যায় মোগল সৈন্য বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। মহা-যোদ্ধা টোডরমল্ল সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়নপর দায়ুদখাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, রাজা সমরসিংহ সানন্দ-চিত্তে টোডর-মল্লের সহিত শত্রুপরিপূর্ণ বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিতে নির্গত হইলেন। তণ্ডা হইতে বীরভূমি, বীরভূমি হইতে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর হইতে কটক, টোডরমল্ল যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই আমার স্বামী তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। যে যে যুদ্ধে টোডরমল্ল জয়লাভ করিয়াছিলেন, রাজা সমরসিংহ সেই সেই যুদ্ধে আপনার নৈসর্গিক বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে বীরত্ব ও সাহসের কি এই পুরস্কার?

পরে কটকের নিকট যে মহাযুদ্ধ হয় তাহাতে মোগল সেনাপতি মনাইমখাঁ স্বয়ং বর্ত্তমান ছিলেন। মোগলেরা প্রায় পরাস্ত হইয়াছিল। মনাইমখাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আলমখাঁ যুদ্ধে নিহত হইলেন; কিন্তু রাজা টোডরমল্ল ও রাজা সমরসিংহ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। রাজা টোডরমল্ল বলিলেন, "আলমখাঁর মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি; মনাইমখাঁ পলায়ন করিয়াছেন তাহাতেই বা আশঙ্কা কি; সাম্রাজ্য আমাদের হস্তে আছে, আমাদের হস্তেই থাকিবে।" এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে আমার স্বামী সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া শত্রু-ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, মোগল সৈন্য বঙ্গদেশীয় জমীদারের সাহস দেখিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিল, দায়ুদখাঁ পরাস্ত হইলেন। তৎ-পরেই পাঠানগণ বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দিয়া মোগলদিগের সহিত সন্ধি

স্থাপন করিল। সেই সন্ধি সংস্থাপনের সময়ে মনাইমখাঁ দায়ুদখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঠানরাজ! প্রায় এক বৎসর আপনি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, দিল্লীশ্বরের কোন্ সেনাপতি যুদ্ধে অধিকতম সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি অবশ্যই বলিতে পারেন।" পাঠানরাজ উত্তর করিলেন, "প্রথম ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল, দ্বিতীয় বঙ্গীয় জমীদার রাজা সমরসিংহ।" এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে সমগ্র দরবার জয়ধ্বনি ও কোলাহলে প্লাবিত হইল; সেই জয়ধ্বনি বায়ুমার্গে আরোহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিল; চতুর্বেষ্টিত দুর্গে—যথায় আমি একাকিনী উপবেশন করিয়া যুদ্ধে স্বামীর বিপদ্ আশঙ্কা করিতেছিলাম—প্রবেশ করিয়া আমার শরীর কণ্টকিত করিল! অদ্য কি না সেই সমরসিংহের বিদ্রোহ অপবাদে শিরশ্ছেদন হইল! দেবদেব মহেশ্বর! ইহার কি ইহকালে প্রতিহিংসা নাই, পরকালে বিচার নাই?

ছিন্ন-তার বীণার মত সহসা মহাশ্বেতার গম্ভীর স্বর থামিয়া গেল। শিখিধ্বজবাহন বলিলেন—ভগিনি! পূর্ব্বকথা স্মরণে যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিবার আবশ্যক কি? বিশেষ, রাজা সমরসিংহের যশোবার্ত্তা বঙ্গদেশে কে না অবগত আছে? সে কথা বিবৃত করিয়া সমরসিংহের পত্নীর হৃদয়ে ব্যথা পাইবার আবশ্যক কি?

মহাশ্বেতা। সমরসিংহের পত্নী নহি, এককালে সমরসিংহের রাজমহিষী ছিলাম, এক্ষণে নিরাশ্রয়া বিধবা!—আমার আর অধিক বলিবার নাই, শ্রবণ করুন।

সতীশচন্দ্র নামে পাঠানদিগের একজন চতুর কর্ম্মচারী ছিল; পাঠান-গৌরব অস্তপ্রায় দেখিয়া সে পাঠানপক্ষ ত্যাগ করিয়া রাজা টোডরমল্লের আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমার স্বামীই সেই বিনীত ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া রাজা টোডরমল্লের নিকট লইয়া যান, এবং অনেক সহায়তা করেন।

ব্রাহ্মণ চতুর ও কার্য্যদক্ষ; সেনাদিগের রসদ আহরণে, শত্রুদিগের অভিসন্ধি অনুভব করণে, এবং কুটিল চক্রান্ত দ্বারা শত্রুদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ সাধনে বিশেষ তৎপর ছিল। রাজা টোডরমল্ল সতীশচন্দ্রের উপর তুষ্ট হইলেন, রাজপ্রসাদে সতীশচন্দ্র ক্রমে খ্যাতি, ধন ও বিস্তীর্ণ সম্পত্তি লাভ করিল।

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সতীশচন্দ্রের ভীষণ উচ্চাভিলাষ হইল, বঙ্গদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান হইবার আশা হইল, আমার স্বামীর প্রতি বিজাতীয় হিংসা হইল! আপনারা বলেন, লোকের উপকার করিলে লোকে কৃতজ্ঞ হয়; আমার স্বামী দরিদ্র সতীশচন্দ্রের উপকার করিয়া কালসর্প হৃদয়ে পুষিলেন!

রাজা টোডরমল্ল বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করাতে সতীশ-চন্দ্র সুযোগ পাইল। জাল কাগজ প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করিল যে রাজা সমরসিংহ উড়িষ্যার পাঠানরাজ দায়ুদ খাঁর সহিত গোপনে সন্ধি করিয়াছেন! বঙ্গের মুসলমান সুবাদার এই অপূর্ব্ব কথা বিশ্বাস করিলেন; রাজা সমরসিংহ বিদ্রোহী বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল; পামর সতীশচন্দ্র আমাদের বিস্তীর্ণ জমীদারী পুরস্কারস্বরূপ অপলাভ করিয়া আজি বঙ্গ-দেশের দেওয়ান হইয়াছেন!

ভ্রাতঃ! আমার কথা শেষ হইয়াছে। এই শোকে আমি পাগলিনী হইয়াছি; এই নরহত্যার প্রতিহিংসার জন্য আমি ব্রত ধারণ করিয়াছি!

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিখণ্ডিবাহন দেখিলেন, মহাশ্বেতার ব্রতভঙ্গের চেষ্টা করা বৃথা; অগ্নি-রাশিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ মাত্র। বলিলেন—তবে আমি পিতাকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিব?

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন—হাঁ, বলিবেন যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্নিকট, নরঘাতকের দণ্ড সন্নিকট। রাজা টোডরমল্ল তৃতীয়বার বঙ্গদেশে আসিয়াছেন; তাঁহার যুদ্ধকার্য্য শেষ হইলে সমরসিংহের বিধবা তাঁহার নিকট সমরসিংহের বধের জন্য বিচার প্রার্থনা করিবে! পিতাকে বলিবেন যে পক্ষীশাবক ব্যাধকর্ত্তৃক আহত হইলে আপনার যাতনায় ক্রন্দন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু মানিনী ফণিনী পদাহত হইলে আঘাতকারীকে দংশন করিয়া হর্ষে, হেলায় প্রাণত্যাগ করে!

বলিতে বলিতে মহাশ্বেতা আসন ত্যাগ করিয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, মহাশ্বেতার সমস্ত শরীর কম্পিত ও কণ্টকিত! তিনি গৃহের দ্বার উদ্ঘটিত করিলেন; প্রভাতের আলোকচ্ছটা তাঁহার কুঞ্চিত ললাটে পতিত হওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগ তরুণ অরুণ-কিরণে সুবর্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, ডালে ডালে নানা পক্ষী নানা রঙ্গে গান করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সরলা ও অমলা।

> WE Hermia, like two artificial gods,
> Have with our needles created both one flower,
> Both on one sampler, sitting on one cushion,
> Both warbling of one song, both in one key;
> As if our hands, our sides, voices and minds,
> Had been incorporate. So we grew together,
> Like to a double cherry seeming parted,
> And yet a union in partition,
> Two lovely berries moulded on one stem
>
> *Shakespeare.*

বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষীগণ শব্দ করিবার অনেক পূর্ব্বেই সরলা গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইল। ঘর, দ্বার, প্রাঙ্গণ, সকল পরিষ্কার করিল। পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, রাজকুমারীর কি এ সকল কায সাজে? সরলা যে রাজকুমারী, তাহা সে জানিত না। পিতার মৃত্যুর সময় সে অল্পবয়স্কা বালিকা ছিল, তখনকার কথা প্রায় একবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার মাতাও একথা তাহাকে কখন বলেন

নাই, তাহার বালিকা হৃদয়ে অহঙ্কার বা অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। চিরকাল কুটীরে বাস করিয়া মাতাকে ভাল বাসিবে, কৃষক-পত্নীদিগের সহিত আলাপ, সহবাস করিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চাভিলাষ তাহার সরলান্তঃকরণে কখন স্থান পাইত না।

গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া সরলা মৃৎকলস লইয়া নদীতে স্নান করিতে চলিল। প্রতিদিনই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার স্নান সমাপন হইত। পথিমধ্যে এক কুটীরপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "সই!" কেহ উত্তর দিল না। পুনরায় ডাকিল, "সই অমলা!" "যাইলো!" এই বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে কে উত্তর দিল। ক্ষণেক পরে এক পঞ্চদশবর্ষীয়া, প্রখর নয়না, চঞ্চলহৃদয়া রমণী বাহিরে আসিল। তাহার পরিধান এক রাঙ্গাপেড়ে শাটী, বক্ষে কলস, হাতে শাখা, পায়ে মল। আসিয়াই সরলার চুল ধরিয়া টানিয়া চিম্‌টী কাটিয়া বলিল—তোর যেমন আক্কেল, আমার ঘরে বৃদ্ধ স্বামী, আমাকে কি এত ভোরে আসিতে দেয়? তোর কি বল্, মা বিবাহ দিলেন না, সমস্ত রাত্রি ভাবনায় নিদ্রা হয় না, প্রভাত হইতে না হইতে ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচিস্। এই বলিয়া সরলাকে আবার চিম্‌টী কাটিল ও হাসিতে হাসিতে গাল টিপিয়া দিল।

সরলা বলিল—সই, তুমি আমাকে আসিতে বল, তাই আমি ডাকিতে আসি।

অমলা। তা না হইলে আসিতে না?

সরলা। আসিতাম।

অমলা। কেন আসিতে?

সরলা। তা আমি জানি না। সকালে উঠিয়াই তোমার মুখখানি মনে পড়ে। যদি একদিন তোমায় না দেখি, তা হ'লে আমার সমস্ত দিন কায কর্ম্মে মন থাকে না।

অমলা প্রেমপূর্ণলোচনে সরলার মুখখানি নিরীক্ষণ করিল, বালিকার মুখখানিও প্রেমরাশিতে টলমল করিতেছে। ক্ষণেক পর অমলা বলিতে লাগিল,—

সই, আর শুনেছ—জমীদারের কাছারির নূতন খবর শুনেছ?

সরলা। না, কি খবর?

অমলা। আমাদের জমীদার নাকি এক বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন; মেয়ে নাকি বড় রূপসী, রূপ যেন বিদ্যুতের মত, আর চক্ষু দুটা যেন—যেন—দুটী কালো কালো ভোমরার মত।

সরলা। তার পর?

অমলা। তার পর সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাদের জমীদারের ছেলে নাকি বলিলেন, "আমি ও মেয়েকে বিবাহ করিব না।"

সরলা। কেন?

অমলা। কেন, তা জানি না, শুনিয়াছ, কোন পল্লীগ্রামে কোন এক গরিব মেয়েকে দেখিয়া মন হারাইয়াছেন। তা সেই মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য নাকি গৃহত্যাগী হইয়াছেন। আমার সইকেই বা দেখিয়া থাকিবেন।

সরলা। তামাসা কর কেন সই? আচ্ছা, বাপ্ বলিতেছেন একজনকে বিবাহ করিতে, ছেলে আর একজনকে বিবাহ করিবেন?

অমলা। তা যার যাকে মনে ধরে ; বাপ্ যাহাকে বিবাহ করতে বলেন, তাহাকে যদি মনে না ধরে ?

সরলা। কেন ধর্‌বে না ?

অমলা। তুই যেমন হাবা, তোকে আর কত শিখাব। বলি, মাকে বল্ বিবাহ দিতে, তাহা হইলে সব শিখ্‌বি। এই বলিয়া আবার সরলার গাল টিপিয়া দিল।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইল। নদীর তীরে যাইয়া এক অপরূপ দর্শন দৃষ্ট হইল। তথায় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণা, দীর্ঘায়তা, ছিন্নবসনা এক স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান আছে। তাহার গলদেশে অক্ষমালা, হস্তে দণ্ড, শরীরে ভস্ম, চক্ষু রক্তবর্ণ ও ঘুর্ণায়মান। দেখিয়া দুই জনই বিস্মিত হইল। অমলা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে গা ?

সে উত্তর করিল—আমার নাম বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী। অমলা বলিল—হাঁ হাঁ আমি বিশু পাগ্‌লীর নাম শুনিয়াছি। তুমি আগে এ গ্রামে একবার আসিয়াছিলে না ?

বিশ্বেশ্বরী। আসিয়াছিলাম।

অমলা। তুমি না হাত দেখিতে জন ?

বিশ্বেশ্বরী। জানি।

অমলা। আচ্ছা, আমার হাত দেখ দেখি ?

পাগলিনী হাত দেখিয়া ক্ষণেক পর বলিল—তুমি দেওয়ানের গৃহিণী হইবে।

অমলা। দূর পাগ্‌লী, আমার স্বামী বর্ত্তমান ; বলে কি না দেওয়ানের স্ত্রী হবে। আমার দেওয়ান উজীরে কাজ নাই আমার বৃদ্ধ স্বামী বাঁচিয়া থাকুক্। এখন বল দেখি আমার

সইয়ের কবে বিবাহ হবে? বিবাহের ভাবনায় সইয়ের রাত্রিতে ঘুম হয় না।

পাগলিনী অনেকক্ষণ সরলার হস্তধারণপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, আবার হস্ত দেখিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল, "তোমার ভবিষ্যৎ আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন; কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি ও ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। সম্প্রতি তুমুল প্রলয় উপস্থিত, তাহার পর কি আছে বলিতে পারি না। তিন দিন মধ্যে ঝড় আসিবে, অদ্যই এ গ্রাম হইতে পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর!"

সরলা ভীত হইল। অমলা প্রিয়সখীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পাগলিনীকে উপলক্ষ করিয়া বলিল, "ধান ভানিতে শিবের গীত! আমি কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, সইয়ের বিবাহ হইবে কবে, উনি আকাশ, মেঘ, প্রলয়ের কথা আনিলেন! দাঁড়া তো, আমি পাগ্‌লীকে জব্দ করি।"

এই বলিয়া অমলা পাগলিনীর গায়ে জল দিতে লাগিল, পাগলিনী ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া গেল। দূরে যাইয়া পুনরায় সরলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর!"

এদিকে অন্যান্য কৃষকপত্নীগণ আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। রামী, বামী, শ্যামী, নৃত্যের বৌ, হরির মা, ইত্যাদি অনেক গ্রাম্য সুন্দরী আসিয়া ঘাট আলো করিয়া বসিল। নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা ও রঙ্গরসে ঘাট জমকাইয়া তুলিল। ইচ্ছামতী নদী এত সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিয়া আনন্দে স্ফীত

হইয়া কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল; গ্রাম্য সুন্দরীরাও আনন্দে কল্ কল্ শব্দে গল্প আরম্ভ করিল। গল্পের মধ্যে অল্পবয়স্কারা স্বামীর কথা ও প্রাচীনারা পরনিন্দার কথা আনিল। সরলা ও অমলা কলসে জল লইয়া নিজ নিজ গৃহে আসিল।

অমলার স্বামীর সহিত পাঠক অগ্রেই পরিচিত হইয়াছেন। নবীনদাস জাতিতে কৈবর্ত্ত, সে গ্রামের একজন মহাজন ছিল, ও অনেক প্রকার ব্যবসাও করিত। তাহার স্বভাব অতি শান্ত ও সরল। তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্গতিও ছিল। প্রায় একশত বিঘা জমী, ২০।২৫টা গরু, ৪।৫ খানা লাঙ্গল ও বাটীর মধ্যে আট দশটা গোলা ছিল। আর লোকের মুখে এমনও শুনা যাইত যে নগদ কিছু টাকা মাটীতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন আপন পত্নীকে অনেক গহনাও দিয়াছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সের সময় দশমবর্ষীয়া অমলাকে বিবাহ করে। এখনও বৃদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অমলা উপহাস করিয়া তাহাকে "বৃদ্ধ স্বামী" বলিয়াই ডাকিত। অমলা স্নেহবতী ভার্য্যা, কিন্তু অত্যন্ত রসিকা। "বৃদ্ধ স্বামীর" সেবা শুশ্রূষা করিত, কিন্তু দিবারাত্রি উপহাস করিতেও ক্ষান্ত থাকিত না। এ প্রকার পত্নী পাইয়া বৃদ্ধ স্বামীর স্নেহের ও সুখের সীমা ছিল না।

সরলার রুদ্রপুরে আগমন অবধি অমলা তাহাকে আপন সোদরা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত, প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিত। দুঃখের সময়ে সরলার নির্ম্মল বালিকা-মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখ একবারে ভুলিয়া যাইত, সুখের সময়ে

সরলার প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুইটী দেখিতে পাইলে সুখ দ্বিগুণ হইত। ছয় বৎসর কাল একত্র থাকিয়া তাহাদের স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ভালবাসার শেষ ছিল না। সরলা সময় পাইলেই অমলার নিকট যাইত, অমলা অবকাশ পাইলেই সরলার নিকট আসিত, কতদিন তাহারা দুইজনে মধ্যাহ্নে একত্র একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, কতদিন রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত দুইজনে নিভৃত স্থানে বসিয়া গল্প করিত। দুই-জনের বিচ্ছিন্ন হইবার ইচ্ছা নাই, সুতরাং সে গল্পেরও শেষ নাই। ফলতঃ, তাহাদিগের শরীর বিভিন্ন হইলেও একই মন, একই প্রাণ, একই হৃদয় ছিল।

সরলা বাটী আসিয়া দেখিল, মাতা ও ব্রহ্মচারী ঘর হইতে বাহির হইলেন। সরলা বলিল—"মা, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাও নাই?"

মহাশ্বেতা। না মা, ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছিলাম, কথায় কথায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তোমার আজ ঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে।

সরলা। হ্যাঁ মা, আজ ঘাটে বিশু পাগলী নামে এক স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। এই বলিয়া সরলা সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। তাহার মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর জন্য অনেক অন্বেষণ করাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর দেখা গেল না।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। মহাশ্বেতা দৈনিক রীত্যনুসারে স্নানার্থ গমন করিলেন। কুটীরে সরলা একাকিনী কায করিতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিবশতঃই হউক,

বা অনেকক্ষণ একাকিনী বলিয়াই হউক, সরলার মুখমণ্ডল যেন কিছু ম্লান বোধ হইতেছে, সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সরলার হৃদয়ে ছায়া ঘনীভূত হইতেছে। চিন্তা কিছুই নাই, দুঃখ কিছুই নাই, তথাপি হৃদয়-আকাশ যেন অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই, স্মৃতিতে কোন পরিতাপ নাই, অথচ হৃদয় আপনা হইতেই ভারগ্রস্ত। সম্মুখে চরকা ঘুরিতেছে, ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু দেখা যাইতেছে, সরলা একাকিনী বসিয়া কার্য্য করিতেছে ও অতি মৃদুস্বরে এক এক বার গান করিতেছে। অতি মৃদু গুণ্ গুণ্ শব্দে একটী খেদের গান এক বার, দুই বার, তিন বার সাঙ্গ হইল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—

"সরলা!"

যিনি ডাকিলেন তিনি একজন যুবাপুরুষ, বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। মুখমণ্ডল অতি সুশ্রী ও ঔদার্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু ঈষৎ গম্ভীর ও ম্লান। কেশবিন্যাসে কিছুই যত্ন নাই, সুতরাং নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল অধুনা মালিন্য প্রাপ্ত হইয়া মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিতেছে। চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ, কিন্তু দারিদ্র্য, অথবা দুঃখ, অথবা চিন্তায় চতুষ্পার্শ্বে কালিমা পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, বক্ষঃস্থল আয়ত, বাহুযুগল দীর্ঘ, শরীর গম্ভীর ও শান্ত, অথচ তেজোব্যঞ্জক, আকৃতি দেখিলে সহসা বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ গীত হইতেছিল, আগন্তুক নিস্পন্দ-শরীরে পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন ও অনিমেষলোচনে সরলার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বোধ হয়, যেন সরলার শোকাবহ গানে আগন্তুকের হৃদয়ে কোন শোকচিন্তার উদ্রেক

হইয়াছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যুবক সরলার নাম উচ্চারণ করিলেন—

"সরলা!"

সরলা হঠাৎ পশ্চাতে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিল, "ইন্দ্রনাথ?"

ইন্দ্রনাথ। সরলা! তোমার সংসারে কি এতই বৈরাগ্য হইয়াছে যে, এরূপ শোকাবহ গান গাহিতেছে?

সরলা। না, আমি মনে কিছুই ভাবি নাই, আমার মনে কোন ভাবনাই নাই, তবে আমি ঐ একটী ভিন্ন আর গান জানি না, সেই জন্য আমি ঐটী বার বার গাহিতেছিলাম। সই আমাকে অনেক গান শিখাইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার কেবল ঐটী মনে লাগে, যখন একলা থাকি, তখন বসিয়া বসিয়া গাই। আমি কি জানি যে তুমি লুকাইয়া শুনিতেছ? এই বলিয়া সরলা মুখ নত করিল। ক্ষণেক পর আবার বলিল—মা পূজা করিতে গিয়াছেন, আমাদের দাসী হাটে গিয়াছে, সেই জন্য আমি একলা বাড়ীতে আছি। তুমি বস, দাসী এখনই আসিবে।

এতক্ষণ একাকিনী থাকিয়া সরলা যেরূপ ম্লান হইয়াছিল, চিরপরিচিত বন্ধুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া সেইরূপ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। সরলার কি কথা? সরলচিত্ত বালিকার যে কথা, সরলা সেই কথাই কহিতেছিল। কখন ভ্রাতার কথা কহিতেছিল; কখন আপন কার্য্যের কথা কহিতেছিল; কখন ক্ষুদ্র উদ্যানে লইয়া গিয়া আপনি যে পুষ্পচারা রোপণ করিয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছিল।

ইন্দ্রনাথ আগ্রহপূর্ব্বক তাহাই শুনিতে ও দেখিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে নিবিড় বৃক্ষাবলীর ভিতর দিয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে আকাশ সুবর্ণবর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে বৃক্ষপত্রের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের আলোক দেখা যাইতে লাগিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্র উচ্চে আরোহণ করিয়া নীল আকাশে স্বর্ণ-আলোক বিস্তার করিল। সে আলোকে সরলার সুগোল শরীর প্লাবিত করিল, সুন্দর বদনমণ্ডলের কিশোর ভাব বর্দ্ধন করিল, সুহাসপরিপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আরও মধুরিমাময় করিল, শান্তজ্যোতিঃ নয়নদ্বয় স্নেহরসে আপ্লুত করিল। ইন্দ্রনাথেরও মুখে কথা নাই, সস্নেহনয়নে সেই সুবর্ণ-পুত্তলীর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল, সেই সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল, সেই প্রেমপ্লাবিত নয়ন, সেই স্মিতমধুর ওষ্ঠাধর, সেই মোহন মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অনেক ক্ষণ পরে বলিলেন, "সরলা!"

ইন্দ্রনাথের গম্ভীর স্বরে সরলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, তাঁহার ম্লান মুখ আরও ম্লান হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, "সরলা! বোধ হয়, তোমার সহিত আমার এই শেষ দেখা।" সরলার প্রফুল্ল নয়নে এক বিন্দু জল আসিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তুমি কি আর রুদ্রপুরে থাকিবে না?"

ইন্দ্রনাথ। না; আমি আর রুদ্রপুরে থাকিব না; কারণ বোধ হয় তুমি পরে জানিতে পারিবে।

সরলা। কেন, তোমার এ গ্রামে থাকিতে কোন ক্লেশ

হইতেছে? তুমি কেন আমাদের বাড়ী থাক না? আমি মাকে বলিলে মা সম্মত হইবেন। আমাদের যাহা সামান্য আয় আছে, তাহাতে তোমার এখানে কোন কষ্ট হইবে না, স্বচ্ছন্দে থাকিবে।

ইন্দ্রনাথ। সরলা, তোমার দয়ার শরীর, তোমার স্নেহ অসীম। কিন্তু আমার থাইবার কষ্ট কিছুই নাই, আমি নবীন দাসের বাড়ীতে অতিথি হইয়া আছি, তোমার সই আমাকে বিশেষ যত্ন করেন, তাহাত তুমি জান। এখানে স্থান না হইলেও আমার থাকিবার অন্য স্থান আছে। আমি অন্য কারণে গ্রাম ত্যাগ করিতেছি।

সরলা। নিতান্তই কি গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে?

ইন্দ্রনাথ। সরলা, আমি চলিয়া গেলে কি তোমার মনে কষ্ট হইবে?

সরলা। কষ্ট হইবে না? আমাদের আর কে আছে বল?

ইন্দ্রনাথ। সরলা, তোমার মনের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু আমি কোনও প্রকারে আর এ গ্রামে থাকিতে পারি না। সরলা, বিদায় দাও; যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, পুনরায় দেখা করিব; না হয়, এই শেষ।

ইন্দ্রনাথের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না, সরলার প্রশান্ত নীলোৎপলসদৃশ চক্ষুতে অশ্রু টল টল করিতে লাগিল। সরলা ইন্দ্রনাথকে ভ্রাতার মত ভালবাসিত, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভালবাসা আপন হৃদয়-কোরকে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিত না; বিদায় দিতে এমন যাতনা হইবে, তাহা জানিত না।

সেই পৌর্ণমাসী রজনীতে, সেই নিভৃত উদ্যানে, উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া, উভয়ের হস্তধারণ করিয়া, পরস্পরের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; পরস্পর দর্শন-সুধা সতৃষ্ণনয়নে পান করিতে লাগিলেন; পরস্পরের বদনমণ্ডল দেখিয়া হৃদয়ের যাতনা কিছু কিছু প্রশমিত করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ স্নেহভরে সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

সরলা, আমি ধর্ম্মের গৌরবের জন্য, পাপের দণ্ডের জন্য, যাইতেছি। ভগবান্ আমাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। যদি তিনি সাহায্য করেন, তবে কাহাকে ভয়? অবশ্যই কৃত-কার্য্য হইয়া আবার তোমারই নিকট আসিব।

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, "যদি এস, কবে আসিবে?"

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছয় মাসের মধ্যে আসিব। আজ পূর্ণিমা, আজ হইতে সপ্তম পূর্ণিমা তিথিতে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে। যদি না হয়, তবে জানিবে ইন্দ্রনাথ আর এ জগতে নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারদেশে শব্দ হইল। সরলা বুঝিল, দাসী আসিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দিতে গেল। ইন্দ্রনাথ অনিমেষলোচনে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও মনে মনে বলিলেন—

ভগবান্, সহায় হও, যেন এই রমণীরত্নলাভ করিতে পারি। যদি না পারি, এ হৃদয় শুষ্ক হইবে, এ জীবন মরুভূমি হইবে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রপুর পরিত্যাগ।

AND there were sudden partings, such as press
The life from out young hearts, and choking sighs
That ne'er might be repeated. Who could guess,
If e'er again should meet those mutual eyes,
Since upon a night so sweet such awful morn could rise.

Byron.

রাজা সমরসিংহ রায় বঙ্গদেশীয় সমস্ত হিন্দু জমীদার-দিগের সম্পদকালে পরম বন্ধু ও বিপদকালে অবলম্বন এবং আশ্রয় ছিলেন। তিনি নিজ সাহস ও বাহুবলে যে খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা স্বধর্ম্মাবলম্বী জমীদারদিগের গৌরব বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ বিপদকালে তাঁহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হন নাই, এ প্রকার জমীদার প্রায় বঙ্গদেশেই ছিল না। ইচ্ছাপুরের প্রজারঞ্জক জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজা সমরসিংহের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। নগেন্দ্রনাথও রাজা সমরসিংহকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ

শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না।

রাজা সমরসিংহের মৃত্যুর পর বিধবা রাজ্ঞী ও রাজকুমারীর জন্য নগেন্দ্রনাথ অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ছদ্মবেশে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করাতে কেহই তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইল না। বিশেষতঃ, রাজা সমরসিংহের অপত্যের নিমিত্ত অধিক স্নেহ প্রকাশ করিলে দেওয়ান সতীশচন্দ্রের ক্রোধভাজন হইতে হইবে, এই বিবেচনায় আন্তরিক স্নেহও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংবৃত রাখিতে হইয়াছিল। মানবহৃদযে স্নেহরজ্জু অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী; স্বার্থপরতা সৎপরোনাস্তি প্রবল। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে নগেন্দ্রনাথ আপনার উন্নতিপথে ধাবিত হইতে লাগিলেন; যাহাতে ধন, মান, ক্ষমতা বর্দ্ধন হয়, যাহাতে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ও দেওয়ান মহাশয়ের প্রণয়ভাজন হইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে অভাগা বিধবা ও অনাথা কন্যার কথা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। বৎসর মধ্যেই সে দুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন। রাজা সমরসিংহের যে বিধবা স্ত্রী ও অনাথা কন্যা আছে, তাহা নগেন্দ্রনাথের স্মরণপথ হইতে এককালে দূরীভূত হইল।

পাঠক মহাশয়, নগেন্দ্রনাথকে কৃতঘ্ন বলিয়া মনে করিবেন না। এই অখিল ভূমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করুন। ইহার মধ্যে কয় জন উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য আপন পথে কাঁটা দেন, কয়জন পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণে

আপন স্বার্থসাধনে বিরত হন? স্নেহ, দয়া, মায়া, এ সকল স্বর্গীয় পদার্থ। কিন্তু স্বার্থপরতা প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে স্নেহ কত দিন থাকে, মায়ার পাত্র নয়নের বহির্গত হইলে মায়া কত দিন থাকিতে পারে? আমরা যদি নগেন্দ্রনাথের প্রতি রাগ করিয়া থাকি, তবে নগেন্দ্রনাথকৃত অপরাধ হইতে আপনারা নিরস্ত থাকিতে যেন চেষ্টা করি। বোধ করি, অনেক দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্ব আমাদিগের মুখ চাহিয়া আছে, তাহাদিগকে যেন আশ্রয় দান করি; বোধ করি, অনেক অনাথা বিধবা যাতনায় ও কষ্টে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছে, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহায়তা দানে যেন ধাবমান্ হই। এ দুঃখপূর্ণ সংসারে চারিদিকে যে দুঃখরাশি দেখিতে পাই তাহা সমস্ত নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য; কিন্তু যদি একজন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিতে পারি, একজন তৃষার্ত্তকে স্নেহবারি দিয়া তুষ্ট করিতে পারি, একজন অনাথিনীর নয়নজল মোচন করিতে পারি, তবে এ কার্য্যক্ষেত্রে আমরা বৃথা জন্ম ধারণ করি নাই।

নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এ জগতে বৃথা জন্ম ধারণ করেন নাই। ধনবান্ জমীদারের পুত্র হইয়াও ধনে তাঁহার আদর ছিল না; উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন; কখন কখন কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন; সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিত, যে সময়ে গো-শালায় গাভী সকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার

তিনি কুটীরাবলীর পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্যে সন্তোষ, জ্ঞানশূন্যতায় দোষশূন্যতা, দুঃখ ও ক্লেশে তপস্বীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আলোচনা করিতেন, দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে যুগ যুগান্তরেও প্রজাদিগের অপরিবর্ত্তিত অবস্থা আলোচনা করিতেন। কতবার প্রজাদিগের সামান্য বিষয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেন—অমুক গ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন হইতেছে; অমুক গ্রামে ধান্য দুর্মূল্য হইতেছে; এ স্থানের মহাজন বড় শিষ্ট লোক; ও স্থানের গোমস্তা বড় অত্যাচরী—সুরেন্দ্রনাথ এই সকল কথাই আগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। এরূপ সময়ে তিনি আপন ধনমর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেন; আপন কুলগৌরব বিস্মৃত হইতেন; সেই ধান্যক্ষেত্রবেষ্টিত, আম্রকাননশোভিত কুটীরবাসিদিগকে আপন ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার মত তাহাদিগের সাহায্যে তৎপর হইতেন।

যখন মহাশ্বেতা বালিকা কন্যা লইয়া চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করেন, সুরেন্দ্রনাথ আপন পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া অনেক দিন অন্বেষণের পর তাঁহার সন্ধান পাইলেন। তৎকালে মহাশ্বেতা ইচ্ছামতী-তীরে মোহন্ত চন্দ্রশেখরের নিকট মহেশ্বরমন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয়দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অভিমানিনী মহাশ্বেতা দরিদ্রাবস্থায়ও গর্ব্বিতা ছিলেন, সহায়তা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বার বার উপরোধ করিলেন, কিন্তু মহাশ্বেতা বার বার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "রাজা

সমরসিংহের বংশ এই দরিদ্রাবস্থায়ও মাননীয়, পরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। এ কথায় সুরেন্দ্রনাথ অগত্যা উপরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বলিলেন—আপনার স্বামীর নিকট আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক বিষয়ে ঋণগ্রস্ত আছি, এই অসময়ে যদি কোন প্রত্যুপকার না করিতে পারিলাম, তবে চিরকাল আমার জন্ম বিফল মনে করিব। অতএব যদি আমাদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ না করেন, বলুন, আর কি প্রকারে আপনার উপকার করিতে পারি? মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন—তবে তোমার জমীদারীর মধ্যে আমাকে থাকিবার স্থান দান কর, আমি বৎসরে বৎসরে তাহার খাজানা দিব, আর কোন নদীতীরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেও, তথায় প্রতিরাত্রে পূজা করিব। ইহা ভিন্ন আমার প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই। সুরেন্দ্রনাথ রুদ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, এবং সেই অবধি মহাশ্বেতা ও তাঁহার কন্যা তথায় থাকিতেন।

যে সময় সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখরের নিকট গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ছদ্মবেশ, তখনই তিনি ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশেই তিনি দেশে দেশে অনুসন্ধান করিয়া মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, ছদ্মবেশেই তাঁহার সহিত সেই নিস্তব্ধ আশ্রমে সরলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইচ্ছামতীতীরে কতবার তিনি বালিকাকে খেলা দিয়াছেন; কতবার তাহাকে গল্প বলিয়াছেন, কতবার তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিয়াছেন। এইরূপ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও সরলার মধ্যে সোদর সোদরার প্রেম জন্মিয়াছিল। তাহা

ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাব অন্তরে উদয় হইয়াছে, তাহা অদ্য-কার এই পূর্ণিমা রজনীর পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারেন নাই।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় মহাশ্বেতা পূজা সমাধা করিয়া গৃহে আসিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট বিদায় লইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইন্দ্রনাথ বলিলেন—

আপনি যে দৃঢ় ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সতীশচন্দ্রের নিধন সাধন না করিলে বোধ হয়, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পাইব না।

মহাশ্বেতা। পাইবে না।

ইন্দ্রনাথ। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি অদ্যই সেই অভি-প্রায়ে যাত্রা করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, অবশ্যই মনোরথ সিদ্ধ হইবে।

মহাশ্বেতা। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দেবদেব মহেশ্বর তোমার যত্ন সফল করুন। কিন্তু তুমি বালক, সেই চতুর বুদ্ধিকুশল দেওয়ানকে কিরূপে পরাস্ত করিবে, আমার বুদ্ধির অগোচর।

ইন্দ্রনাথ। অধুনা আমারও বুদ্ধির অগোচর, দেখা যাউক কি হয়।

মহাশ্বেতা। অবশ্যই তোমার জয় হইবে—ধর্ম্মের যদি জয় না হয়, তবে এ সংসার ছারখার হইবে, কেহ আর ভগবানের আরাধনা করিবে না।

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—ধর্ম্মের যদি সর্ব্বদা জয় হইত তবে আপনার স্বামী নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, সতীশচন্দ্রও বঙ্গদেশের দেওয়ান হইতেন না, মানবজাতি কখন ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিত না। যখন চারিদিকে পাপের

গৌরব দেখিতেছি, যখন অত্যাচারী ও কপটাচারীগণ ধন, মান, ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেছে, যখন পরমধার্ম্মিক, পবিত্রচেতা, পরোপকারীগণ নিষ্পীড়িত ও পদদলিত হইতেছেন, তখন আর সংসার ছারখার হইবার বাকী কি ? যদি সদাই ধর্ম্মের জয় থাকিত, তাহা হইলে পাতক ও কপটাচরণ এ সংসার হইতে একবারে দূরীভূত হইত। তথাপি কেন যে অধর্ম্মের জয় হয়, কে বলিবে ? ভগবানের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে ?

পরে মহাশ্বেতা বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর কথা ইন্দ্রনাথকে বলিলেন। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—এই পাগলিনী মানুষী, কি যোগিনী, কি প্রেতকন্যা, বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার কথা কখনও মিথ্যা হয় নাই।

মহাশ্বেতা। কখনও মিথ্যা হয় নাই। আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিয়াছিল। আমি স্বামীকে সবিশেষ অবগত করাইয়া সপরিবারে পলাইবার উপদেশ দিলাম। সেই বীরপুরুষ যে উত্তর দিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে অদ্যাপি জাগরিত রহিয়াছে। বলিলেন—ঘোর সংগ্রামস্থলে হিন্দু কি মুসলমান, মোগল কি পাঠান, কেহ কখন সমরসিংহকে পলায়ন করিতে দেখে নাই—আজি পামর সতীশচন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিব ? মরিতে হয় মরিব, যোদ্ধার তাহাতে ভয় কি ?

ইন্দ্রনাথ বলিলেন—সেইবার ভিন্ন আরও দুই তিন বার ঐ পাগলিনী যে যে কথা বলিয়াছে, তাহা সত্য হইয়াছে। আমার পরামর্শে আপনাদিগের এই গ্রাম হইতে পলায়ন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

মহাশ্বেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। উক্ত পাগলিনী দুই তিন বার এই প্রকার সহসা দেখা দিয়া যে যে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়াছিল, কখনও মিথ্যা হয় নাই। তিনি অন্তরে নিশ্চয় জানিলেন যে, সেই পামর সতীশচন্দ্র আবার সমরসিংহের নিরাশ্রয় বিধবার অনিষ্টচেষ্টা করিতেছে, পাগলিনী মানুষী হউক বা প্রেতকন্যা হউক, জানিতে পারিয়া সতর্ক করিবার জন্য আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—অদ্যই পলায়ন করা শ্রেয়ঃ, উপায়ান্তর নাই।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাইবেন—আমার আলয়ে কি আপনাকে আহ্বান করিতে পারি?

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন—মহেশ্বর মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্র শেখরের নিকট পুনর্ব্বার যাইব। ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগে গমন করিলেন।

মহাশ্বেতা সরলাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া সবিশেষ বলিলেন। সরলার বালিকা-মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। রুদ্রপুর গ্রামে ছয় বৎসর কাল থাকিয়া সকল দ্রব্যে মায়া হইয়াছিল। সেই পরিপাটী কুটীর, সেই উদ্যান, সেই স্বহস্তরোপিত পুষ্পচারা, সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া আর রুদ্রপুরের পক্ষীদিগের সুললিত গান শুনিতে পাইবে না, দুই প্রহরে সেই আম্রবৃক্ষের নিস্তব্ধ, স্নিগ্ধ ছায়াতে উপবেশন করিয়া আর কার্য্য করা হইবে না, সন্ধ্যায় অমলার সেই সুমধুর হাস্যবিকসিত মুখ আর দেখিতে পাইবে না। অমলার কথা স্মরণ হওয়াতে চক্ষুতে জল আসিল, বলিল—

মা আমি সইয়ের নিকট বিদায় লইয়া আসি। মহাশ্বেতা বলিলেন—যাও মা, কিন্তু শীঘ্র আসিও।

সরলা বিদায় লইতে চলিল।

অমলার গৃহের নিকট যাইয়া ডাকিল, "সই !" প্রফুল্লবদনা অমলা গৃহের বাহিরে আসিল। কি তামাসা করিবে বলিয়া তাহার অধরোষ্ঠে হাসি দেখা দিতেছে ; কিন্তু সরলার মুখপানে চাহিয়া অমলার প্রফুল্লমুখ গম্ভীর হইল ; অধরের হাসি শুকাইয়া গেল। দেখিল সরলার নয়নযুগল জলে ছল্ ছল্ করিতেছে, টস্ টস্ করিয়া বক্ষঃস্থলে জল পড়িতেছে। অমলা নিকটে আসিয়া স্নেহভরে হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি সই, কি হইয়াছে ?

সরলা উত্তর করিল—মা বলিয়াছেন, আমরা এই গ্রাম হইতে অদ্যই চলিয়া যাইব, তোমার সঙ্গে বোধ হয়, এই শেষ দেখা—এই বলিয়া সরলা অমলার বক্ষঃস্থলে আপন মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সহসা এই কথা শুনিয়া অমলার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হইল। প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু সরলার অবস্থা দেখিয়া সন্দেহেরও স্থল থাকিল না। তখন অমলা অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, চক্ষুজলে সরলার কেশ সিক্ত করিল।

অনেকক্ষণ পর কষ্টে চিত্ত সংযম করিয়া অমলা বলিতে লাগিল—সেকি সই ? আমার সঙ্গে আবার শেষ দেখা ? তুমি যেখানে থাকিবে, আমি সেইখানে যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিব। এক্ষণে এ গ্রাম হইতে তোমরা কেন যাইবে, বল দেখি ?

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল—তাহা আমি জানিনা; মা তাহা বলেন নাই; কিন্তু আমরা ইচ্ছামতী-তীরে মহেশ্বর-মন্দিরে যাইতেছি।

অমলা বলিল—তা মহেশ্বর-মন্দির আর রুদ্রপুর ত এপাড়া ওপাড়া, প্রত্যহ যাইয়া তোমায় দেখিয়া আসিব। তার জন্য আবার ভাবনা কিসের?

ক্ষণেক পর অমলা বলিল—দাঁড়াও সই, আমি শীঘ্রই আসিতেছি—বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। শীঘ্র বাহিরে আসিয়া সরলার কাপড়ের অঞ্চলে কি বাঁধিয়া দিল। সরলা জিজ্ঞাসা করিল—কি দিলে সই? অমলা উত্তর করিল—ও কিছু নহে, পথে ক্ষুধা পাইবে, সেই জন্য কিছু মুড়ি আর ফুটকড়াই আঁচোলে বাঁধিয়া দিতেছি। আমার মাথা খাও, ফেলিয়া দিও না। এই বলিয়া কাপড়ে ১০টী রৌপ্যমুদ্রা বাঁধিয়া দিল।

বিদায়ের সময় অমলা সইয়ের হাত ধরিয়া বলিল—সই, কিছু ভাবিও না আমি মহেশ্বর মন্দিরে শীঘ্র তোমার সহিত দেখা করিতে যাইব। আর পাছে ইহার মধ্যে আমাকে ভুলিয়া যাও, সেইজন্য আমার একটী চিহ্ন তোমার গায়ে রাখিয়া দি। এই বলিয়া আপন গলদেশ হইতে সোণার চিক লইয়া সরলার গলায় পরাইয়া দিতে গেল। সরলা বাধা দিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে অমলা বলিল—যদি না লও, তবে আমি জানিব, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ; যদি আমাকে কখন ফিরাইয়া দিতে চাহ, তবে জানিব আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। সরলা নিরুত্তর হইল। অমলা তাহাকে সেই চিক

পরাইয়া দিল, এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রিয় সইকে বিদায় দিল।

এদিকে ইন্দ্রনাথ নৌকা ঠিক করিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও ইন্দ্রনাথ সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা ধীরে ধীরে ইচ্ছামতী নদী দিয়া চলিতে লাগিল। কোন কোন স্থানে নদী প্রশস্ত হইয়াছে, উভয় পার্শ্বে প্রান্তর, অটবী ও গ্রামস্থ বৃক্ষলতাদি চন্দ্রালোকে অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে নদী এমন সংকীর্ণ হইয়াছে যে, উভয় পার্শ্বস্থ বংশ-শাখা লম্বিত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাহার নিবিড় পত্ররাশির মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে ইচ্ছামতীর স্বচ্ছ সলিল উজ্জ্বল করিতেছে। ইচ্ছামতীর নীল জল কল্ কল্ করিতেছে ও তাহার উপর দিয়া ক্ষুদ্র তরী তর্ তর্ করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। সরলা এই প্রকার শোভা সন্দর্শন ও শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই নিদ্রিত হইল। ইন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিয়া সমস্ত রাত্রি আপনি অনিদ্র হইয়া সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোক-দীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে নৌকা ইচ্ছামতী-তীরস্থ এক ক্ষুদ্র গ্রামে লাগিল। সেই গ্রাম প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দির হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূর ও চারিদিকে কাননে বেষ্টিত, সেই জন্য উহাকে বনগ্রাম বলিত। মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য পূজক সময়ে সময়ে মন্দির হইতে আসিয়া এই গ্রামে বাস করিত। আরোহীগণ নামিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতি-বাহন করিয়া চন্দ্রশেখরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিমলা।

Now naught was heard beneath the skies,
The sounds of busy life were still,
Save an unhappy lady's sighs,
That issued from the lonely pile.

Mickle.

সন্ধ্যাকাল সমাগত। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর ভীমকান্তি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। যমুনা নদী চতুর্দ্দিকে দুর্গ বেষ্টন করিয়া কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। দুর্গের চারিদিকের দৃশ্য অতি রমণীয়। সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, মনোহর হরিৎ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও পশ্চিম মেঘে রক্তিম আভা দেখা যাইতেছে। দুর্গপাদচারিণী, শান্ত প্রবাহিনী নদীর নির্ম্মল বক্ষে সেই আভা প্রতিফলিত হইতেছে। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে অবতরণ করিতেছে; অবতরণ করিয়া সায়ংকালীন নিস্তব্ধতাকে অধিকতর মনোহর করিতেছে।

প্রান্তরে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে বায়ুহিল্লোলে দূরস্থ পল্লীর ক্রমশঃ মন্দীভূত রব শ্রুত হইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে পরিশ্রান্ত গৃহাভিমুখগামী কৃষকদিগের শ্রমাপনোদন গীত কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছে।

দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ এরূপ নহে। তথায় একটী প্রশস্ত আম্রকানন; উহা এত প্রশস্ত যে দুর্গ হইতে সেই আম্রবৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সেই আম্রবৃক্ষের ভিতর পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎ-মালা দেখা দিতে লাগিল; নিকটে, দূরে, উচ্চে, নীচে সেই খদ্যোৎমালা খেলা করিতে লাগিল। উদ্যানের ভিতর সুন্দর সরোবর, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, সরোবরের চারিদিকে নানাপ্রকার কীট পতঙ্গ স্ব স্ব রবে সায়ংকালের কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে।

বাহির হইতে দেখিলে দুর্গের উচ্চ প্রাসাদ সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত—কেবল একমাত্র গবাক্ষ হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। সেই গবাক্ষপার্শ্বে এক অল্পবয়স্কা রমণী আসীনা—হস্তে গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন।

রমণী গগনমণ্ডলের একমাত্র উজ্জ্বল তারার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারও সুন্দর সীমন্তে একমাত্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ড ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

রমণীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ হইবে—যৌবনে সর্ব্ব অঙ্গ অসাধারণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু এ সাধারণ নারীজাতির সৌন্দর্য্য নহে। সে রূপরাশির সম্মুখে দাঁড়াইলে সহসা প্রেমের সঞ্চার হয় না, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঞ্চার হয়।

শরীর ক্ষীণ, উন্নত ও দীর্ঘায়ত, অথচ কোমলতা পরিপূর্ণ। ললাট অতি সুন্দর সুবঙ্কিম, অথচ উচ্চ ও প্রশস্ত; এরূপ প্রশস্ত ললাট পুরুষের কদাচিৎ দেখা যায়, স্ত্রীলোকের কখনই সম্ভবে না। নয়নের স্থির উজ্জ্বলতা, ওষ্ঠের সুচিক্কণতা, সমস্ত বদনের উন্নত, গম্ভীর ভাব, হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে; সমস্ত অবয়বের ভাবভঙ্গী দেখিলে হঠাৎ প্রতীয়মান হয় যে, এ তীক্ষ্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী তন্বঙ্গী মানুষী নহেন—কোন যোগপরায়ণা স্বর্গবাসিনী মানবজাতির উন্নতি সাধনার্থ এই মর্ত্ত্য জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

সেই নিস্তব্ধ সায়ংকালে গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া রমণী সেই সুন্দর নির্ম্মল আকাশপথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রমণীর বদনমণ্ডলও অপরূপ সুন্দর ও নির্ম্মল। রজনী গভীর হইতে লাগিল; আকাশের বিস্তীর্ণ নীলবর্ণ ক্রমে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; রমণীর হৃদয়েও যেন চিন্তারজনী গভীর হইতে লাগিল। তাঁহার প্রশস্ত ললাটও যেন ক্রমশঃ ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল অধিক-তর কুঞ্চিত হইতে লাগিল; নয়ন হইতে তীক্ষ্ণতর উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল।

এই সময়ে একজন পুরুষ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "বিমলা"। বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা সতীশচন্দ্র আসিয়াছেন।

যে পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে না; কিন্তু আকার দেখিলে সহসা ষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। মস্তকের অধিকাংশ কেশ শুক্ল, ললাট

চিন্তারেখায় অঙ্কিত, শরীরের চর্ম্ম শিথিল, সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষীণ, তথাপি চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতির্ম্ময় ও মুখমণ্ডলে চিন্তাদেবী সততই অধিষ্ঠান করিতেছেন। ধীর আচরণ, ধীর গমনাগমন, ধীর অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসঞ্চালন। নানারূপ বহুদূরদর্শিনী বহুদূরব্যাপিনী কল্পনাতে তাঁহার জীবন ও অন্তঃকরণ চিরকালই পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে ঈষৎ হাস্যসহকারে ডাকিলেন, "বিমলা!"

বিমলাও পিতাকে দেখিয়া আপন গভীর ভাবনা কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। বদনমণ্ডলে গম্ভীরভাব ক্রমে অপনীত হইয়া পবিত্র পিতৃস্নেহের আবির্ভাব হইল। পিতা কক্ষে আসিয়াছেন, অনবধানতা বশতঃ এতক্ষণ দেখিতে পান নাই, মনে করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—বিমলা! এত কি দুঃখ হইয়াছে যে, মৌনভাবে এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছ?

বিমলা উত্তর করিলেন—আপনি কল্য দুর্গ ত্যাগ করিবেন, কতদিন আপনাকে দেখিতে পাইব না, কত দিন এই প্রকাণ্ড দুর্গ শূন্য থাকিবে; এই চিন্তায় আমার মন অস্থির হইয়াছে, আমি আপন মন শান্ত করিতে পারিতেছি না।

পিতা উত্তর করিলেন—সে কি বিমলা, কেন মিথ্যা ভাবনা করিতেছ? আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব; আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারি?

বিমলা। পিতা, আপনি যে আমাকে অতিশয় স্নেহ করেন

তাহা জানি—পিতা কন্যাকে ইহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারেন না।

সতীশ। তবে চিন্তা করিতেছ কেন? আমি ত প্রতি বৎসরই একবার রাজধানী যাইয়া থাকি, এবার তোমার বিশেষ চিন্তা কেন?

বিমলা। প্রতিবৎসর আমার এ প্রকার ভাবনা হয় না; এবার সহসা হৃদয়ে ভয় হইয়াছে, কেন জানি না। পিতা, আপনি গৃহে থাকুন, কোথাও যাইবেন না।

শেষ কথাগুলি অতি অৰ্দ্ধস্ফুট মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইল—শুনিয়া সতীশচন্দ্রের হৃদয়ও যেন আহত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন—

বিমলা, কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ? আমাকে যাইতেই হইবে; যাইবার সময় রোদন করিও না।

বিমলা উত্তর করিলেন—পিতা, মিথ্যা ভয় নহে, কল্য রজনীযোগে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বোধ হইল যেন স্বর্গীয়া মাতা দেখা দিলেন, সাশ্রুলোচনে যেন অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "মা সাবধান! ঘোর বিপদ্ সমাগত!" এখনও বোধ হইতেছে, তাঁহার শুষ্ক মুখখানি—তাঁহার অশ্রুপূর্ণ লোচন দুইটী দেখিতে পাইতেছি। কি পাপ করিয়াছি, বলিতে পারিনা; কি পাপে স্নেহময়ী-মাতাকে হারাইলাম, জানি না; আবার কি ঘোর বিপদ্ সমাগত, ভগবানই জানেন। পিতা, ক্ষমা করুন। আমার ভাবনা হইতেছে, আপনি প্রস্থান করিলে আর এ আলয়ে প্রত্যাগমন করিবেন না।

এই বলিয়া বিমলা বাষ্পাকুলিতলোচনে পিতার নিকট

যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন বদনমণ্ডল লুকাইলেন। বিমলার যদি স্থিরভাব থাকিত, দেখিতে পাইতেন যে পিতারও মুখ-মণ্ডল সহসা বিকৃতি ধারণ করিয়াছিল। স্বপ্নকথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন—যেন ভয়াবহ কোন পূর্ব্ব-কথা হৃদয়ে সহসা জাগরিত হইল, যেন কোন গূঢ় পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেইক্ষণেই আরম্ভ হইল। যখন বিমলা পিতার হৃদয়ে মুখ রাখিয়া রোদন করিতেছিলেন, পিতার সান্ত্বনা করিবার আর ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই সতীশচন্দ্র আপন চিত্ত সংযম করিয়া স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন—

বিমলা, এ সকলই তোমার মিথ্যা ভয়। দিবাযোগে তুমি কেবল মিথ্যা চিন্তা কর, তাহাতেই রজনীযোগে সেই প্রকার ভয়ের স্বপ্ন দেখ। আমি দেখিয়াছি, গত কয়েক দিন অবধি তুমি কেবলই চিন্তামগ্ন রহিয়াছ, আমাকে যথার্থ করিয়া বল, সে মহাচিন্তার কারণ কি।

বিমলা ধীরভাবে উত্তর করিলেন—পিতা, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অবশ্যই তাহার উত্তর করিব; আপনার নিকট লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই। আপনিই সে মহাচিন্তার কারণ। অদ্য প্রায় এক মাস হইতে আপনাকে কোন গভীর দুঃখে বা চিন্তায় মগ্ন দেখিতেছি, দিন দিন সেই চিন্তা গাঢ়তর হইতেছে। আপনার আহারের সময় খাদ্যদ্রব্যে মন থাকে না, রজনীকালে আপনার নিদ্রা হয় না, যদি নিদ্রা হয়, সে কুস্বপ্ন-পরিপূর্ণ। আমি কতবার দিবাযোগে লুকাইয়া আপনার কক্ষে গিয়াছি; যতবার যাই, দেখি, আপনি সেই চিন্তায় মগ্ন। নিশিযোগে আমি কতবার আপনার শয়ন-

গৃহে গিয়াছি, যখনই যাই, দেখি কোন কুস্বপ্নে আপনার ললাট কুঞ্চিত ও বদন বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। কি ঘোর চিন্তায় আপনাকে এ প্রকার যাতনা দিতেছে? সামান্য জমীদার, সামান্য কৃষকও দৈনিক পরিশ্রমের পর রজনীতে বিশ্রাম লাভ করে, বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের কি সে বিশ্রামে অধিকার নাই?

বিমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন, দেখিলেন, পিতা স্থির-ভাবে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছেন, পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

গত এক মাস অবধি আপনার নিকট এত চর আসিতেছে কেন? চর এত গুপ্তভাবে আসিয়া গুপ্তভাবে চলিয়া যায় কেন? দিবারাত্রি আপনিই বা কোন্ গুপ্ত পরামর্শে ব্যস্ত আছেন? বঙ্গদেশের দেওয়ানের কার্য্যের ভার অতি গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের সুশাসন ও প্রজার মঙ্গল যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, সে কার্য্য ও সে পরামর্শ কি রজনী দ্বিপ্রহরের সময় গৃহের কবাট রুদ্ধ করিয়া ক'কগুলি নিভৃত চরের সহিত সিদ্ধ হয়? বালিকার এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, যদি আমি অপরাধ করিয়া থাকি, পিতা মার্জ্জনা করুন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ; বিবেচনা করিয়া দেখুন, খল-স্বভাব সর্পেরিই গতি বক্র; উদারচিত্ত মনুষ্যের গতি সরল। যাহার চরিত্র সরল, যাঁহার উদ্দেশ্য সরল, তাঁহার গতি বক্র হইবে কেন? পিতা, বালিকার কথায় অবধান করুন, কপট লোকের পরামর্শ ত্যাগ করুন, ধর্ম্মের পথ—সরল পথ—অবলম্বন করুন, তাহা হইলে কাহাকেও ভয় থাকিবে না, কোন চিন্তা

থাকিবে না। পাপপথে সর্ব্বদাই ভয়, ধর্ম্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক।

বলিতে বলিতে বিমলার উদার ললাট ও বদনমণ্ডল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার উজ্জ্বল নয়নযুগল হইতে উজ্জ্বলতর আভা বহির্গত হইতে লাগিল। বিমলা অতিশয় পিতৃবৎসলা কন্যা, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে নৈসর্গিক গৌরব ও ধর্ম্মবল বিরাজ করিত। সেই গৌরবের আবির্ভাব হইলে জনাকীর্ণ রাজসভায় যিনি বাক্‌পটুতার জন্য শত শত বার প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকার কথায় তিনি নিরুত্তর হইতেন।

"পাপ পথে সর্ব্বদাই ভয়, সরল ধর্ম্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক," এই কথা অর্দ্ধস্ফুটবচনে উচ্চারণ করিতে করিতে সতীশচন্দ্র সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাপিষ্ঠে পাপিষ্ঠে।

TRY what repentance can : What can it not ?
Yet what can it when one cannot repent ?
O wretched state ! O bosom black as death !
O limed soul that struggling to be free,
Art more engaged. Help angels, make assay !
Bow stubborn knees ! and hearts with strings of steel,
Be soft as sinews of the new-born babe,
All may be well.

Shakespeare.

সতীশচন্দ্র বাহিরে আপন কক্ষে যাইলেন। ভৃত্য প্রভুর সেবা করিতে আসিল, সতীশচন্দ্র তাহাকে মুষ্টি প্রহার করিয়া বলিলেন—শকুনিকে ডাক্। ভৃত্য বেগে প্রস্থান করিল।

বাহিরের কক্ষ অতি প্রশস্ত ও অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। গৃহতল অতি সুচারু চিত্রশোভিত বস্ত্রে মণ্ডিত; প্রতিদ্বারে, প্রতিবাতায়নে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে; স্থানে স্থানে স্তূপাকারে পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে; সম্মুখে সুগন্ধ তৈলপূর্ণ

দীপ জ্বলিতেছে ; দীপের চতুষ্পার্শ্বে আবার পুষ্পগুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে। সতীশচন্দ্রের উপবেশন স্থান মহার্হ রক্তবস্ত্রে মণ্ডিত, সেই সুন্দর কক্ষে, সেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত, মহাধনসম্পন্ন, রাজাধিরাজ দেওয়ান সতীশচন্দ্র আজি বিষণ্ণ বদন কেন ?

পাঠক যদি আমাদের মত দরিদ্র লোক হয়েন, যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কখন "বিষয়ী" লোকের বিষয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, কখন যদি সতৃষ্ণ নয়নে রাস্তা হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বাবুর বৈঠকখানার ঝাড়লণ্ঠনের প্রতি নয়নপাত করিয়া থাকেন, যদি কখন অর্থের আবাসস্থানকে সুখের আবাসস্থান মনে করিয়া থাকেন, তবে আসুন একবার লক্ষপতি সতীশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া মন শান্ত করি, লোভ দূর করি।

সতীশচন্দ্রের হৃদয় পাপে কলুষিত, পাপান্ধকারে আবৃত, সেই পাপরাশির মধ্যে একটীমাত্র পুণ্য ছিল, বিমলার প্রতি নির্ম্মল অপত্যস্নেহ সূক্ষ্ম আলোক-রেখার ন্যায় সেই পাপান্ধ-কারের মধ্যে দেখা যাইত। কন্যাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, কন্যাকে অতি স্নেহের সহিত লালনপালন করিতেন, স্ত্রীবিয়োগের পর অবধি কন্যার সহিত অনেক সময়ে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন, বিষয় কর্ম্মের কথাও কন্যার সহিত আলো-চনা করিতেন, এইজন্যই কন্যাও কখন কখন পিতাকে বন্ধুর মত উপদেশ দিতে সাহস করিতেন। বিমলাও অতিশয় স্নেহবতী কন্যা, পিতার সুখবর্দ্ধন ভিন্ন তাঁহার আর কোন লালসা ছিল না। কিন্তু নিতান্ত স্নেহবতী হইয়াও বিমলা

উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা ও মানিনী; পিতাকে কপটাচারী দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইতেন। আলোকের উদয়ে অন্ধকার লীন হয়, সত্যের ও সরলতার সম্মুখে পাপ ও কপটতা স্বভাবতঃ ভীত হয়, বিমলার সম্মুখে সতীশচন্দ্র নিরুত্তর হইতেন। সতীশচন্দ্রের চরিত্র কতদূর পাপে কলুষিত, তাহা বিমলা জানিতেন না; ভক্তিভাজন পিতার চরিত্রে যে অধিক পাপ আছে, তাহা বিমলার নির্ম্মল অন্তঃকরণে একবারও স্থান পায় নাই; তথাপি পিতার আচার ব্যবহার দেখিয়া সম্প্রতি বিমলার চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দুলিত হইয়াছিল ও সেই সন্দেহ তাঁহার যার পর নাই যাতনার কারণ হইয়াছিল।

কখন কখন একটী ঘটনাতে, বা একটী কথাতে, বা একটী সঙ্গীতে, সহসা আমাদের হৃদয়ের কবাট খুলিয়া যায়, সাগর-তরঙ্গের ন্যায় অনন্ত চিন্তালহরীতে হৃদয় সহসা প্লাবিত হয়, বহু-কালের বিস্মৃত কথা সহসা স্মরণপথে উদয় হয়। স্নেহবতী কন্যার সস্নেহ তিরস্কার-বচনে যেন সেই প্রকার হইল। সতীশচন্দ্রের হৃদয়কেন্দ্র ব্যথিত হইল, সহস্র চিন্তায় প্লাবিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল। শৈশবকালে যে খেলা করিয়াছিলেন, বাল্যকালে যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। যে বিদ্যালাভ তাঁহার পক্ষে বিষময় ফল ধারণ করিয়াছিল, সেই বিদ্যালাভের আরম্ভ-কথা মনে জাগরিত হইতে লাগিল। সমবয়স্কদিগের সহিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, অধ্যয়নের পর সেই বয়স্যদিগের সহিত নিষ্পাপ, নিশ্চিন্ত চিত্তে ক্রীড়া রহস্য করিতেন। আজই তিনি বঙ্গদেশের একজন প্রধান লোক,

লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিপতি। সেই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলে কি এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই নিষ্পাপ, নিশ্চিন্ত চিত্ত ফিরিয়া পাওয়া যায়?

বাল্যকাল অতীত হইল, যৌবনকাল সমাগত। সেই যৌবনকালে তাঁহার স্মৃতিপথে কি গভীর পাপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে! বিদ্যাদর্প, তাহার পর ধনদর্প, তাহার পর প্রবল দুর্দ্ধর্ষ উচ্চাভিলাষ! তাঁহার পক্ষে সেই কাল উচ্চাভিলাষ কি ভয়ানক বিষময় ফল ধারণ করিয়াছে!

তাহার পর সেই প্রজারঞ্জক মহানুভব বীরপুরুষ রাজা সমরসিংহের কথা সতীশচন্দ্রের পামর হৃদয়ে উদিত হইল। যে মহাত্মা বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ ছিলেন, জমীদারদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাস্বরূপ ছিলেন, কায়স্থকুলের নেতাস্বরূপ ছিলেন, সতীশচন্দ্র তাঁহার প্রাণসংহার করাইয়াছেন। সমরসিংহের শোণিতাপ্লুত ছিন্নমস্তক তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল, সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন, যেন সেই শোণিতাপ্লুত ছিন্নমস্তক বিকৃতি-ধারণ-পুরঃসর তাঁহার দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছে, যেন বলিতেছে, "পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই।" সতীশচন্দ্র সম্মুখে আর চাহিতে পারিলেন না, দীপ নির্ব্বাপিত করিলেন। রে মূর্খ! স্মৃতি-দীপ অত শীঘ্র নির্ব্বাণ হয় না।

ঘোর অন্ধকারে বসিয়া সতীশচন্দ্র কি চিন্তা করিতেছেন? কাহার সাধ্য সে চিন্তা অনুভব করে। সহস্র বৃশ্চিক-দংশনাপেক্ষা সে চিন্তা ক্লেশদায়িনী। যাতনায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন—এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? যদি থাকে, হৃদয়ের

শোণিত দিয়াও তাহা করিব। ভগবন্! সহায় হও, এখনও বালিকার কথা শুনিয়া কার্য্য করিব, এখনও ধর্ম্মপথে ফিরিতে চেষ্টা করিব। সত্য কথা স্বীকার করিব, পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিব, যদি ক্ষমা না পাই, আমার অকিঞ্চিৎকর শোণিত দিয়া সমরসিংহের রক্তপ্রবাহ বর্দ্ধন করিব।

পরক্ষণেই শকুনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—এ কি? অন্ধকারে একাকী বসিয়া আছেন কেন?

সতীশচন্দ্র অতিশয় গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—আলোক সহ্য করিতে পারি না, হৃদয়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমার জীবনালোকও শীঘ্র অনন্ত অন্ধকারে লীন হইবে, আমার লীলাখেলা সাঙ্গপ্রায়।

শকুনি এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, ভৃত্যকে আলোক আনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য শীঘ্র আলোক আনিয়া পুনরায় কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন—শকুনি! তোমার পরামর্শেই আমি এতদূর কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে কি ফল হইল? আমার পরকাল অনেক দিনই গিয়াছে, এক্ষণে ইহকালেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এই পাপরাশিতে, এই বিপদরাশিতে তুমিই আমাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ, এক্ষণে আর কি করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন উন্নতিশালী লোকের সর্ব্বনাশ কল্পনা কর; আমিও, ঘোর পাপের যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহাতে প্রবৃত্ত হই।

শকুনি প্রভুর গম্ভীরস্বর শুনিয়া চমকিত হইলেন। বুঝিলেন, প্রভুর হৃদয়ে সামান্য ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয়

নাই; দুই চারি কৈতব অশ্রুবিন্দু দেখাইয়া শকুনি উত্তর করিলেন—

প্রভুর গৌরবকালে তাঁহারই স্নেহভাজন হওয়া ভিন্ন আমার অন্য অভিলাষ ছিল না, যদি যথার্থই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, প্রভুর সর্ব্বনাশের ভাগী হওয়া ভিন্ন আমার দ্বিতীয় অভিলাষ নাই।

সতীশ। শকুনি! তোমার কথা অতি মিষ্ট, বিধাতা কেন এমন বিষপাত্র ক্ষীরদ্বারা আবৃত করিয়াছেন?

শকুনি। আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা না হইলে প্রভুভক্তির এই ফল্ ফলিবে কেন? এই বলিয়া শকুনি আর দুই চারিটী অশ্রুবিন্দু বাহির করিলেন। সতীশচন্দ্র দেখিয়া কিছু মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—

তুমি আমার উন্নতিচেষ্টা কর, তাহা আমি জানি, কিন্তু পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ্। শকুনি! সে পথ ভিন্ন কি আর উন্নতির পথ ছিল না?

শকুনি দেখিলেন, তাঁহার অশ্রুবিন্দু নিতান্ত নিস্ফল হয় নাই, কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন—প্রভুভক্তি যদি পাপ হয়, তবে আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা ভিন্ন পাপ কি, আমি জানি না।

সতীশ। জান না? বঙ্গচূড়ামণি রাজা সমরসিংহকে বিনাশ করিবার পরামর্শ কে দেয়?

শকুনি। রাজাজ্ঞায় তাঁহার দণ্ড হইয়াছে।

সতীশ। ভাল, তাঁহার জমীদারী এক্ষণে কে পাইয়াছে?

শকুনি। সুবাদার স্নেহবশতঃ যাহাকে যে দ্রব্য দান করেন, তাহা সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য।

সতীশ। শকুনি! আর আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। অদ্য আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে ও তদ্দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে এত অন্ধকার, এত পাপ দেখিতেছি যে, সে দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারি না। অদ্য বালিকার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বলিয়া সতীশচন্দ্র বিমলার সহিত কথোপকথন সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন।

শকুনি উত্তর করিলেন—বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ানের কি বালিকার কথায় ভীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ?

সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন—বালিকা যদি সত্য কথা কহে, তবে সে কথা বালিকা-মুখনিঃসৃত বলিয়া পরিহার্য্য নহে। পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ্, তাহা আমি এতদিনে জানিলাম।

শকুনি। যদি আজ্ঞা করেন, তবে বলি, আপনার বিপদ্ কি, আমি দেখিতে পাইতেছি না।

সতীশ। আজি ছয় বৎসর হইল, যখন রাজা টোডরমল্ল প্রথমবার বঙ্গ ও বিহারদেশ জয় করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন, তাহার অনতিবিলম্বে পুণ্যাত্মা সমরসিংহ আমা কর্ত্তৃক নিহত হয়েন; সে কার্য্যে তুমিই পরামর্শ দিয়াছিলে।

শকুনি। দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ বঙ্গ ও বিহারদেশের সেনাপতি মনাইমখাঁর আজ্ঞায় সমরসিংহের দণ্ড হয়।

সতীশ। সত্য, কিন্তু সে আমাদেরই পাপ ষড়যন্ত্রে। তাহার দুই বৎসর পরে, যখন রাজা টোডরমল্ল দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন সমরসিংহের মৃত্যুর বিষয়ে কি মিথ্যা কহিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, বোধ হয় বিস্মৃত হও নাই।

শকুনি। তাহার পর ?

সতীশ। তাহার পর টোডরমল্ল পুনরায় সেনাপতি ও সুবাদার হইয়া মুঙ্গেরে আসিয়াছেন, আর নিস্তার নাই।

শকুনি। যে কৌশলে এতদিন কথা গুপ্ত ছিল, সে কৌশল এক্ষণে ব্যর্থ হইবে কেন ?

সতীশ। দূরদর্শী টোডরমল্ল আমাদের কৌশলে পরাস্ত হইবেন না, তুমি রাজা টোডরমল্লকে জান না।

শকুনি। কিন্তু এই দূরদর্শী রাজাই একবার এই কৌশলে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

সতীশ। সত্য, কিন্তু সেবার দুই এক মাসের জন্য আসিয়াছিলেন, এবার সুবাদার হইয়া আসিয়াছেন, অনেক দিন বাস করিবেন। শকুনি! আমাকে নিবারণ করিও না, আমি তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি একবার আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন পুনরায় ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। তাহার পর আমি এ পাপ সংসারে থাকিব না, যোগী হইয়া এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিব।

শকুনি। তাহা হইলে আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। প্রিয়সুহৃদ্ সমরসিংহের হত্যাকারক সম্বন্ধে রাজা টোডরমল্ল কি আদেশ দিবেন, আপনি কি তাহা বুঝিতে পারেন না ?

এই ব্যঙ্গ বাক্যে সতীশচন্দ্র মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শকুনির কথাই সত্য! গুপ্তকথা অপ্রকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে,

কিন্তু প্রকাশ হইলে প্রাণরক্ষার কিছুই সম্ভাবনা নাই। অনেক-ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—

শকুনি! তুমি আমা অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ, কিন্তু যদি তুমি মূর্ত্তিমান্ পাপ হও, তথাপি তোমার পরামর্শ অবলম্বন ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়।

শকুনি। আপনার সহিত তর্ক করা আমার সম্ভবে না; কিন্তু কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে, বঙ্গদেশের দেওয়ানের বিরুদ্ধে সুবাদারের নিকট অভিযোগ করিতে যাইবে? প্রভো! আমার কথা অবধারণ করুন, যে কথা ছয় বৎসর গুপ্ত আছে, তাহা প্রকাশিত হইবে না। আমি আপনার নিকট পণ করিতেছি, যদি এ কথা না গুপ্ত রাখিতে পারি, তবে আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।

আশার প্রভাব অতি চমৎকার! যে আশা মনুষ্যকে কত সুখ ও সান্ত্বনা প্রদান করে, সেই আশাই আবার কত দুঃখের কারণ হয়। মানবহৃদয়ও অতি চমৎকার! আশার কুহকে কতই খেলা করে। বিপদের সময়, পীড়ার সময়, দুঃখের সময়, হৃদয়ে ধর্ম্মভয় প্রবল হয়, বিপদের শান্তি হইলে, পীড়ার আরোগ্য হইলে, দুঃখের অবসান হইলে, ধর্ম্মভয় ক্রমে ক্রমে দূর হয়। ইতিপূর্ব্বে সতীশচন্দ্র বিপদাশঙ্কা করিতে-ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মভয় মনে জাগরিত হইয়াছিল। ক্রমে কুহকিনী আশা কাণে কাণে বলিতে লাগিল, "ভয় কি? বিপদ্ কোথায়? মিথ্যা ভাবনা কেন?" সতীশচন্দ্রও সেই কুহকে মুগ্ধ হইলেন, ভাবিলেন, বিপদ্ না আসিলেও না আসিতে পারে, ভাবিতে ভাবিতে

বিপদ্‌ভয় অন্তর্হিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভয়ও চলিয়া গেল। মানব-হৃদয়ে বিপদ্‌ভয় যত প্রবল, ধর্ম্মভয় যদি সেইরূপ প্রবল হইত, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে এতাদৃশ দুঃখ থাকিত?

অনেক চিন্তা করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন—শকুনি! তোমার উপরই আমি নির্ভর করিব। আশু বিপদের কি কোন সম্ভাবনা আছে?

শকুনি সময় বুঝিয়া উত্তর করিলেন—আশু কি বিলম্বেও গুপ্তকথা প্রচারের কোন সম্ভাবনা নাই; আর যদিই বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, ভবাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষে কি বিপদের সময় কাতরতা যুক্তিসিদ্ধ? বঙ্গদেশে আপনার যশঃ কে না প্রসংসা করে? ব্রাহ্মণকুলে আপনার মত পবিত্র কুল কাহার? আপনার ক্ষমতার মত ক্ষমতা কাহার? আপনার গৌরবের মত গৌরব কাহার? আপনার অধিকারের মত অধিকার কাহার? বালিকার বাক্য অবলম্বন করিয়া এ সমস্ত সহসা ত্যাগ করা কি বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের পক্ষে উচিত কর্ম্ম? আপনাকে পরামর্শ দিব আমার কি সাধ্য, আপনিই বিবেচনা করুন, আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে, এরূপ পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

সতীশচন্দ্র এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—যাথার্থই কি আমি বাতুল হইয়াছিলাম, বালিকার কথায় ভীত হইয়াছিলাম! শকুনি তাঁহার মুখ দেখিয়া আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, প্রকাশ্যে

বলিলেন—রুদ্রপুরে যে চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সংবাদ শুনিয়াছেন কি ?

সতীশ। না, সেই এক বিষয়ে এখনও ভাবনা আছে। শুনিয়াছি, সমর সিংহের বিধবা ভয়ানক স্ত্রীলোক, টোডরমল্ল দেশে আসিলে হয়ত সেই একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে।

শকুনি। সে ভয় করিবেন না। টোডরমল্ল আসিবার অগ্রেই সমর সিংহের বংশের সকলেরই মুখ বন্ধ হইবে।

সতীশ। তবে কি আমরা যে চর রুদ্রপুরে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সমর সিংহের বিধবাকে ধরিয়া আনিতে পারিয়াছে ?

শকুনি। না এখনও পারে নাই, কিন্তু সে কার্য্য শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে।

সতীশ। পারে নাই কেন ?

শকুনি। শুনিলাম, তাহারা দুই একদিন পূর্ব্বেই সমাচার পাইয়াছিল, সেই পাগলিনী সমাচার দিয়াছিল।

সতীশ। পিশাচী আমার সকল কর্ম্মেই বাধা দেয়, তাহাকে ধরিয়া আনাইতে পার না ?

শকুনি। চেষ্টার ক্রটি নাই, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাই নাই। বোধ হয়, তাহার যথার্থই পৈশাচিক বল আছে, তাহা না হইলে আমাদিগের সকল গুপ্ত অনুসন্ধান জানিতে পারে কিরূপে ? না হইলে একশত চরেও তাহার অনুসন্ধান পাইতেছে না কেন ?

সতীশ। তবে এক্ষণে উপায় কি ?

শকুনি। চিন্তা করিবেন না। শীঘ্রই সকলের মুখ বন্ধ হইবে। আর অধিক রাত্রি নাই, আপনি বিশ্রাম করুন, শকুনি শর্ম্মার মন্ত্রণা হইতে কাহারও নিস্তার নাই।

এই বলিয়া শকুনি আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় দুই একবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভাবিলেন—তোমারও নিস্তার নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধূর্ত্তে ধূর্ত্তে।

CURSE on his perjured arts! dissembling smooth
Are honor, pity, conscience, all exiled?
Is there no pity, no relenting truth?

Burns.

পরদিন প্রাতে দেওয়ানজী মহাসমারোহে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। কন্যার নিকট বিদায় লইবার সময় বিমলা বলিলেন—পিতঃ! আপনি চলিলেন, অনুমতি করুন, আমি প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দিরে যাইয়া আপনার মঙ্গলার্থ পূজা দিব। তথায় আমাকে কিছুদিন অবস্থিতি করিতে হইবে। পিতা সম্মত হইলেন ও অনেক স্নেহগর্ভ বচনে কন্যার নিকট বিদায় লইলেন। কন্যার চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত লইল, পিতা চলিয়া যাইবার সময়, সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিমলা মনে মনে বলিতে লাগিলেন—এই বিপুল সংসারে আপনি ভিন্ন এ হত-ভাগিনীর আর কেহই নাই, আপনি না থাকিলে সংসার

আমার পক্ষে অন্ধকার। ভগবান্ আপনাকে নিরাপদে রাখুন, ধর্ম্মপথে আপনার মতি হউক। আপনার নৈসর্গিক চরিত্র উদার ও অকপট, কুক্ষণে শকুনির সহিত মিলন হইয়াছিল।

শকুনির সহিত বিদায় লইবার সময় শকুনি বলিলেন—আপনি অগ্রসর হউন, আমিও সমর সিংহের বিধবাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া ও অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার নিকট যাইতেছি। সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন—যাহা উচিত হয় কর, আমি তোমারই তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপর নির্ভর করি। সতীশচন্দ্র যখন বহির্গত হইলেন, শকুনি মনে মনে বলিতে লাগিল—বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কি না, হাতে হাতেই টের পাইবে, বড় বিলম্ব নাই।

শকুনির সহিত সতীশচন্দ্রের আজ আট বৎসর পরিচয়। যখন প্রথমে পরিচয় হইয়াছিল, তখন শকুনির বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, সতীশচন্দ্রের বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষ। শকুনি দেখিতে সুশ্রী ছিল ও অল্প বয়সে অনাথ ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া সতীশচন্দ্রের দ্বারে শরণাপন্ন হইয়াছিল। সতীশচন্দ্রও সুকুমার নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন—সেইদিন অবধি হৃদয়ে কালসর্প ধারণ করিয়াছিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শকুনি শীঘ্রই সতীশচন্দ্রের হৃদয় বুঝিল; সতীশচন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ লক্ষ্য করিল; সেই ভীষণ অগ্নিতে দিন দিন আহুতি দিতে লাগিল; আহুতি পাইয়া অগ্নিশিখা দিনে দিনে গগনস্পর্শী হইতে চলিল। এই ঘোর মদে মত্ত হইয়া সতীশচন্দ্র দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হারাইলেন, একেবারে অন্ধপ্রায় হইলেন।

শকুনি সুযোগ পাইল। অন্ধকে কুটিল পথে লইয়া যাওয়া দুরূহ নহে, সৎপরামর্শ হইতে কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল, প্রভুকে সৎপথ হইতে কুপথে লইয়া চলিল। অবশেষে এমন ঘোর পঙ্কে নিমগ্ন করিল যে, তথা হইতে উদ্ধার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। তখন সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, ক্রমে ক্রমে ভ্রম দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তখন পশ্চাত্তাপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শকুনির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিল।

শকুনিকে আশ্রয় দিবার অনতিবিলম্বেই সতীশচন্দ্র তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শকুনির বিনীতভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার পরামর্শে চমৎকৃত ও প্রীত হইয়াছিলেন, দিন দিন তাহাকে অধিকতর স্নেহ করিতেন, আপনার পুত্র নাই বলিয়া শকুনিকে পুত্রের মত ভাল বাসিতেন। কখন তাহাকে পোষ্যপুত্র করিবার কামনা করিতেন, কখন বা তাহাকে আপন দুহিতার সহিত বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে মান হানি হইবে, এই ভয়ে শকুনিকে গৃহ-জামাতা করিতে পারেন নাই। ক্রমে কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু কুলীন-কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইলে ক্ষতি কি? বিশেষ সতীশচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে কন্যার প্রতি স্নেহ দ্বিগুণ হইয়াছিল, কন্যার বিবাহ দিলে গৃহ শূন্য হইবে, এইজন্য বিবাহের বিলম্ব হইতে লাগিল, এইজন্য শকুনিকে জামাতা করিয়া গৃহে রাখিবার সঙ্কল্প হইতে লাগিল।

পরে যখন পাপপঙ্কে পতিত হইয়া সতীশচন্দ্রের চক্ষু

উন্মীলিত হইল, তখন এই সংকল্প আবার দূর হইল। পাপ এরূপ ঘৃণার পদার্থ যে, একজন পাপী অন্য জনকে ভালবাসিতে পারে না ; সতীশচন্দ্র শকুনিকে আর ভালবাসিতে পারিলেন না। উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা দুহিতাকে কুটিলস্বভাব, কপটাচারী শকুনির হস্তে অর্পণ করিবেন, এ ভাবনা সতীশচন্দ্র সহ্য করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন—আমি পাপিষ্ঠ বটে, কিন্তু পাপেরও সীমা আছে। ধর্ম্মপরায়ণ সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু আমার স্নেহের পুত্তলি বিমলাকে নরকে ফেলিতে পারিব না। আমার যাহা হইবার হইয়াছে, বিমলা ধর্ম্মপথে থাকুক। সতীশচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেন, কিন্তু শকুনিকে কিছু বলিতে পারিতেন না। শকুনি সুবাদারের নিকট একটী কথা জানাইলে সতীশচন্দ্রের শিরশ্ছেদন হইবে, তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং তিনি শকুনির একরূপ হস্তগত হইলেন।

শকুনি যে ঘোর পাপিষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য। সতীশচন্দ্রও পাপিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার পাপের সীমা ছিল, তাঁহার চরিত্রে দুই একটী সদ্‌গুণও ছিল, তাঁহার হৃদয়ে দুই একটী মহানুভব লক্ষিত হইত। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত। শকুনির এ সমস্ত কিছুই ছিল না, কেবল ঘোর স্বার্থপরতা ও দুর্ভেদ্য কুটিলতা।

সতীশচন্দ্রের মত তাহার দুর্দ্দমনীয়া বেগবতী মনোবৃত্তি একটীও ছিল না ; তাহার হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তিই শান্ত ; সকল প্রবৃত্তিই ঘোর স্বার্থপরতার অনুচারিণী। উর্ণনাভ যেরূপ বৃক্ষ-পত্রগুলি দেখিয়া ধীরে ধীরে জাল পাতিত করে, শকুনি

সেইরূপ অন্য লোকের মনোবৃত্তির বেগ বুঝিয়া অতি ধীরে ধীরে আপন সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করিত। সে মন্ত্রণাজাল এমন সূক্ষ্ম, এমন দুর্লক্ষ্য ও এমন দুর্ভেদ্য যে, কাহার সাধ্য তাহা ভেদ করে? প্রেম, বন্ধুত্ব, দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি যে সকল সুকুমার মনোবৃত্তি দ্বারা জগৎ বদ্ধ ও মানবজাতি একীকৃত হইয়া রহিয়াছে, শকুনি সে সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। যশে অভিরুচি ও উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি যে সকল দুর্দম মনোবৃত্তি অনেককে বিচলিত করে, তাহা হইতেও শকুনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল। সুতরাং আপন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রণার দ্বারা আপন স্বার্থসাধনে কখনও নিষ্ফল হইত না।

শকুনি সতীশচন্দ্রকে বলিয়াছিল যে, চরেরা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিতে অক্ষম হইয়াছে—সেটী মিথ্যা কথা। শকুনির যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মহাশ্বেতাকে ধরা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য কার্য্য নহে; সে কেবল সতীশচন্দ্রের সহিত শকুনিকে মুঙ্গেরে না যাইতে হয়—এইজন্য। শকুনির বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজাল ভেদ করি, আমাদের কি সাধ্য? পাঠক মহাশয়! চলুন, শকুনি যথায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে, তথায় যাইয়া দেখা যাউক, যদি কিছু জানা যায়।

চতুর্বেষ্টিত দুর্গের প্রশস্ত কক্ষে শকুনি একাকী পদচারণ করিতেছে, চারিদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অবলোকন করিতেছে, দুর্গপদসঞ্চারিণী কল্লোলিনী যমুনার কল কল শব্দ শ্রবণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত দুর্গের শুদ্ধান্তঃপুরদিকে অবলোকন করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডলে আনন্দের লক্ষণ, স্বার্থসাধন হইলে স্বার্থপর লোকের যেরূপ আনন্দ ও উল্লাস

হয়, সেইরূপ আনন্দের লক্ষণ। মনে মনে এইরূপ চিন্তা উদয় হইতেছে—

এই সুবিস্তীর্ণ জমীদারী, এই প্রশস্ত দুর্গ, ঐ অন্তঃপুরবাসিনী সপ্তদশ বর্ষীয়া সুন্দরী শীঘ্রই নব স্বামী গ্রহণ করিবে; সমরসিংহের প্রজাগণ, সতীশচন্দ্রের প্রজাগণ, শীঘ্রই শকুনির নাম উচ্চারণ করিবে; কল্লোলিনী যমুনা শীঘ্রই শকুনির গৌরব-গীত গান করিবে। আর তুমি বিমলে! তুমি আমাকে ঘৃণা কর জানি, কিন্তু ঘৃণার দিন শেষ হইল; তোমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাকে স্বামী বলিয়া আলিঙ্গন করিতেই হইবে; তথাপি যদি ঘৃণা কর, এই পতঙ্গের মত তোমাকে পদে দলিত করিব; এই দলিত মৃত পতঙ্গের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিব। প্রেমের জন্য বিবাহ করিতেছি না, প্রেম বালক বালিকার স্বপ্নমাত্র! তোমার রূপলাবণ্যের জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি না; আমার নিকট রূপলাবণ্যের আদর নাই; যদি থাকিত, লক্ষপতির রূপলাবণ্যের অভাব কি? তবে তোমায় দলিত না করিব কেন? সতীশচন্দ্র, সাবধান! আজি তোমাকে যম মন্দিরে প্রেরণ করিলাম; যেরূপ চর নিযুক্ত করিয়াছি, গুপ্তকথা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে; অধিকন্তু শকুনির দোষও তোমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহার পর? তাহার পর নিঃসন্তান সতীশচন্দ্র গত হইলে তাহার জামাতা ভিন্ন আর কে উত্তরাধিকারী হইবে? তীক্ষ্ণবুদ্ধির চিরকালই জয় হইয়া থাকে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শকুনি দেখিল, অন্তঃপুরে গবাক্ষপার্শ্বে বিমলা এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পিতা

চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পিতার গমনপথ দিক্‌ অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্রন্দন করাতে সেই উন্নত প্রশস্ত ললাটের শিরা স্ফীত হইয়াছে ; চক্ষুর্দ্বয় এখনও জলে ঢল ঢল করিতেছে ; অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে ; উন্নত বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতেছে ; বস্ত্র অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ের যে গভীর বিষণ্ণ ভাব, তাহা বালিকার উচ্চ রোদনে প্রকাশ পায় না, নিঃশব্দ, অলক্ষিত, অবারিত অশ্রুজলে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায়, কথঞ্চিৎ শান্ত হয়!

দেখিয়া শকুনি আপন চক্ষে দুই এক বিন্দু জল আনিয়া আপনিও বাহিরের ঘরের গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইল। বিমলা চক্ষু উঠাইয়া দেখিলেন, শকুনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক্রোধে, ঘৃণায় ভ্রুকুটী করিয়া গবাক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। বিমলার মনোহরণ করিবার জন্য শকুনির এই প্রথম উদ্যম—নিষ্ফল হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

উপাসকে উপাসকে।

ENAMOURED, yet not daring for deep awe
To speak her love :—and watched his nightly sleep,
Sleepless herself, to gaze upon his lips
Parted in slumber, whence the regular breath
Of innocent dreams arose : then when red morn
Made paler the pale moon, to her cold home
Wildered and wan and panting, she returned.

Shelley.

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতী-তীরে প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দির ছিল। সন্ধ্যার সময় বিমলা শিবিকা আরোহণ করিয়া চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই চারিজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক ও অনেক সংখ্যক দাসদাসী চলিল। বঙ্গদেশের দেওয়ানজীর একমাত্র দুহিতার যেরূপ সমারোহে যাওয়া উচিত, সেইরূপ সমারোহে বিমলা মহেশ্বর-মন্দিরে চলিলেন।

অনেক দূরদেশ হইতে অনেক লোক এই মন্দিরে প্রতিদিন সমাগত হইত। বৃদ্ধাগণ পুত্রকন্যার কুশল কামনা করিয়া পূজা দিতে আসিতেন; যুবতীগণ পুত্র আকাঙ্ক্ষায় মহেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিতেন; চিররোগীগণ রোগশান্তি কামনায় এই মন্দিরে আসিতেন; যোদ্ধৃগণ জয়াকাঙ্ক্ষায়, কৃপণগণ ধনাকাঙ্ক্ষায়, যুবকগণ বিদ্যাকাঙ্ক্ষায়, নানাপ্রকারের লোক নানা আকাঙ্ক্ষায় এই মন্দিরে সমবেত হইত। বহুকালের ধন সঞ্চিত হইয়া এই মন্দিরে রাশীকৃত হইয়াছিল, মন্দিরের অট্টালিকাসমূহ দিন দিন দীর্ঘায়ত হইতেছিল। মধ্যে উচ্চ মন্দির, তাহার চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ, উজ্জ্বল, উন্নত সৌধমালা শোভা পাইত। আগন্তুকগণ এই সৌধমালায় বাস করিত, তাহা হইতে যে আয় হইত, তাহাও দেবসেবায় অর্পিত হইত।

এই প্রকাণ্ড অট্টালিকাশ্রেণী মন্দিরের চারিদিকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যবর্ত্তী স্থান অতি বিস্তীর্ণ। সুতরাং মন্দিরের যে কোন দিকে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে কেবল সৌধমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই সৌধমালার ভিতর দিয়া মন্দিরাভিমুখে যাইবার জন্য চারিদিকে চারিটা সিংহদ্বার ছিল। শিবিকা কি শকট সেই সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিতে পারিত, তাহার ভিতর যাইতে পারিত না। সেই সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে আর ধনগৌরবজাত কোন প্রকার বিভিন্নতাই স্থান পাইত না। রাজকুমারী ভিখারিণীর সহিত একত্র পদব্রজে সিংহদ্বার হইতে মন্দির পর্য্যন্ত যাইতেন, ভস্ম-বিভূষিত সন্ন্যাসীর সহিত স্বর্ণ-রৌপ্যালঙ্কৃত মহারাজ একত্রে পথ অতিবাহিত করিতেন।

ধর্ম্মের সম্মুখে উচ্চ কে ? নীচ কে? ধনীই বা কি? দরিদ্রই বা কি ?

যদিচ চারিদিকের সৌধবেষ্টিত মধ্যস্থ ভূমি অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, তথাপি কখন কখন এত লোকের সমাগম হইত যে সেই ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইত। তথায় যে কেবল উপাসকগণ আসিত, এমত নহে ; নানাপ্রকার লোকে নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিত। বালক বালিকার জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়াদ্রব্য, যুবক যুবতীদিগের জন্য নানাপ্রকার অলঙ্কার, সকলের জন্যই পরিধেয়, খাদ্য ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবহার্য্য দ্রব্য তথায় দিবানিশি বিক্রয় হইত। ক্রেতাগণ তথায় দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছে।

যখন বিমলা আপন-সঙ্গিনীদিগের সহিত মহেশ্বর-মন্দিরে পঁহুছিলেন, তখন রজনী আগত হইয়াছে। বিশ্রাম করিয়া আহারাদি করিতে করিতে রজনী দ্বিপ্রহর হইল। বিমলার সঙ্গীগণ তাঁহাকে সে রাত্রিতে পূজা করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু বিমলার হৃদয় চিন্তা-পরিপূর্ণ। তিনি বলিলেন— আমাকে ক্ষমা করুন, আমি উপাসনা না করিয়া অদ্য শয়ন করিব না, যদি করি, নিদ্রা হইবে না। এই বলিয়া বিমলা একাকিনী ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর-মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকাশপটে যেন চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারিদিকে উজ্জ্বল শ্বেত সৌধমালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্যমণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে, সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত

হইতেছে। মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে, যেস্থানে সমস্ত দিন কলরব হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা নয়নরঞ্জন করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে ও নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষ হইতে সুমধুর গম্ভীর রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অন্য রব নাই; কেবল স্থানে স্থানে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; কেবল কখন কখন দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গাভীর হম্বারব শুনা যাইতেছে; কেবল দূরস্তগ্রামবাসীদিগের গীত গান বায়ুপথে আরোহণ করিয়া কখন কখন কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সেস্থানে, সেই গীত শুনিতে বড় সুললিত বোধ হয়।

এই নিস্তব্ধ, শান্তপথে যাইতে যাইতে বিমলার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল; চিন্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইতে লাগিল; প্রকৃতির নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিমলার হৃদয়েও শান্তভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। সেই দেবায়তনে প্রাতঃকালে দুই একটী করিয়া লোক সমবেত হয়; মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না; সায়ংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে; রজনীতে সমস্ত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত! বিমলা বিবেচনা করিতে লাগিলেন—আমাদের জীবনেও এইরূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে; যৌবনে সেই প্রবৃত্তিসমূহের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ—যেন জগৎসংসারকে গ্রাস করিবে; বার্দ্ধক্যে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে; শীঘ্রই শান্ত, নিস্তব্ধ, অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়—বারিবিন্দুর

মত অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়। তবে এত ধূমধাম কেন?—এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত কৌশল, এত মন্ত্রণা কেন? এত ক্রোধ, এত লোভ, এত অর্থলালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন?—কে বলিবে কেন? বিধির নির্ব্বন্ধ কে বুঝিবে? যে পতঙ্গ মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষবিস্তার করিয়া আকাশদিকে ধাবমান্ হওয়া কেন? যে শিশিরবিন্দু মুহূর্ত্ত-মধ্যে মনুষ্যপদে দলিত হইবে বা প্রাত কালের রবিকিরণস্পর্শে শুকাইয়া যাইবে, তাহার হীরকখণ্ডের জ্যোতিঃ বিস্তার কেন?

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিমলা সহসা রজনী দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব শুনিতে পাইলেন, সেই ঘণ্টারব চতুর্দ্দিকস্থ সৌধমালায় প্রতিহত হইয়া দশগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায়ুমার্গে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, নিস্তব্ধ নৈশগগণে আরোহণ করিয়া সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঘণ্টারব শেষ না হইতে হইতে দ্বিপ্রহরের পূজা আরম্ভ হইল। সপ্তস্বরে মিলিত হইয়া মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা গীত হইতে লাগিল; কাদম্বিনীর গম্ভীর নির্ঘোষবৎ সেই গীত কখন মন্দীভূত, কখন সতেজে উচ্চারিত হইতে লাগিল; উপাসকদিগের মন দ্রবীভূত হইতে লাগিল। বিমলা সপ্তস্বরে সেই গানের সহিত যোগ দিলেন; তাঁহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে ও উল্লাসে প্লাবিত হইতে লাগিল।

বিমলা যখন মন্দিরের ভিতর আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন আর অধিক উপাসক ছিল না, প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। বিমলা পূজায় রত হইলেন।

প্রায় এক প্রহর কাল মুদিতনয়নে, নিষ্পন্দশরীরে, বিমলা পূজা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে যে পবিত্র কামনা উদয়

হইতেছিল, বিমলার বদনমণ্ডলে তদনুরূপ পবিত্র ভাব অঙ্কিত হইতে লাগিল। বিমলার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, বন্ধু, কেহ নাই, পিতাই একমাত্র ভক্তির আধার, পিতাই স্নেহের পাত্র, পিতাই পরম বন্ধু, পিতাই পূজনীয় দেবতা। বিমলার অপার স্নেহস্রোত, অপরিসীম ভক্তিস্রোত, সেই একমাত্র আধারাভিমুখে ধাবমান হইল। পিতার দুঃখেই দুঃখ, পিতার আনন্দেই আনন্দ, পিতার বিপদে চিন্তা, পিতার সম্পদে ভরসা, বিমলা পিতার জীবনেই জীবনধারণ করিতেন। সেই পিতার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে করিতে বিমলার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্য্যন্ত ভক্তিরসে প্লাবিত হইল। অর্দ্ধপ্রহর কাল বিমলা উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে যখন বিমলা প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য ও শান্ত।

তখন বিমলা একেবারে মন্দির হইতে বহির্গত না হইয়া ঔৎসুক্যফুল্ললোচনে মন্দিরের চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন এ মন্দিরে আইসেন নাই, মন্দিরের সকল দ্রব্যই নূতন বোধ হইতে লাগিল। বিমলা এরূপ সুনির্ম্মিত, প্রশস্ত, চমৎকার অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। কখন কখন সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পালঙ্কৃত স্তম্ভসমূহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কখন কখন ভিত্তির উপর সুন্দর ভাস্কর-কার্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন; কখন ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে লাগিলেন; কখন দুই এক জন দেববাসীকে মন্দির-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উপা-

সক আর কেহই নাই, সুতরাং বিমলার এইরূপ ঔৎসুক্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই।

একপার্শ্বে একমাত্র উপাসক নিদ্রিত রহিয়াছেন, সহসা বিমলার নয়ন সেই দিকে পতিত হইল। তাঁহার অলৌকিক তেজঃপরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হইলেন, নয়ন আর সে দিক হইতে অন্য দিকে ফিরাইতে পারিলেন না। যুবকের ললাট উদার ও প্রশস্ত, কিন্তু নিদ্রাতেও যেন কোন গাঢ় চিন্তায় কুঞ্চিত রহিয়াছে। নয়ন মুদিত, বদনমণ্ডল উজ্জ্বল ও বীরদর্প প্রকাশক। উপাসকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমলার বোধ হইল যেন কোন বীরপুরুষ বীরব্রতে ব্রতী হইয়া দূরদেশ যাত্রা করিতেছেন, পথিমধ্যে এই দেবমন্দিরে উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অন্য স্থান না থাকাতে উপাসনান্তে এই স্থানেই নিদ্রিত রহিয়াছেন। বিমলার অবলা হৃদয়েও বীর ভাবের অভাব ছিল না; সুতরাং উপাসকের এই অলৌকিক বীর-আকৃতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল। অনিমেষলোচনে সেই বীর পুরুষের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

উপাসকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে উজ্জ্বল-নয়না তরঙ্গী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র বিমলার সংজ্ঞা হইল, অপরিচিত পুরুষের দিকে দেখিতেছিলেন জ্ঞান হইল, লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নিশা প্রভাতপ্রায় হইয়াছে। প্রাতঃকালের প্রথম রশ্মি

বিমলার নয়নোপরি নিপতিত হইল। চারি দিকে দুই এক জন করিয়া লোক বাহির হইতেছে। লোকের সম্মুখে পদব্রজে যাওয়া বিমলার অভ্যাস নাই, বিমলা কুণ্ঠিত হইয়া দ্রুতবেগে বাসস্থানাভিমুখে চলিলেন। প্রাচীনাগণ যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, বিমলা এতক্ষণ কি করিতেছিলেন, তখন তিনি কি বলিবেন? এতক্ষণ কি তিনি উপাসনা করিতেছিলেন?

বিমলার অন্যান্য চিন্তা হইতে লাগিল। এ বীরপুরুষ কে? কি ব্রতে ব্রতী হইয়া সমস্ত রাত্রি উপাসনা করিতেছিলেন? এমন ভাগ্যবান বীরপুরুষের প্রার্থনীয় কি আছে? এইরূপ নানা চিন্তায় অভিভূত হইয়া বিমলা শয়নগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

AMID the jagged shadows
Of mossy leafless boughs,
Kneeling in the moonlight
To make her gentle vows;
Her slender palms together prest,
And heaving sometimes on her breast;
Her face resigned to bliss or bale,—
Her face, O! call it fair not pale,—
And both her eyes more bright than clear,
And each about to have a tear.

Coleridge.

সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর কিঞ্চিৎ আরাম লাভ করিবার জন্য বিমলা আপন শয়নভবনে গমন করিলেন। দিনের বেলা বড় অধিক নিদ্রা হইল না, যাহা হইল, তাহা স্বপ্নে পরিপূর্ণ। সেই দেবপ্রাঙ্গণ, সেই চন্দ্রালোকে মহেশ্বরগীত, সেই দেবমন্দিরে মহেশ্বরমূর্ত্তি, তৎপার্শ্বে সেই উপাসক, বিমলা এই সমস্ত বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে বিমলা দেখিলেন গৃহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে; প্রাঙ্গণে লোকের সমাগম হইয়াছে; কলরব শুনা যাইতেছে। নিশি

জাগরণে বিমলার চক্ষে কালিমা পড়িয়াছে; তাঁহার স্বাভাবিক গৌর-বদন রক্তশূন্য হইয়া অধিকতর গৌর হইয়াছে; কপোলে, গণ্ডে, বক্ষঃস্থলে ঈষৎ ঘর্ম্ম হইয়াছে। বিমলা আলুলায়িত কেশ কথঞ্চিৎ বদ্ধ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সমস্ত দিন বিমলা অন্যমনস্কার ন্যায় হইয়া রহিলেন। পূর্ব্ব-রাত্রির কথা তাঁহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল। অনেক চিন্তা করিয়া কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

সেদিন রজনী এক প্রহরের সময় বিমলা উপাসনার্থ গমন করিলেন। সমস্ত দিন যদিও তিনি অন্যমনস্কা হইয়াছিলেন, উপাসনার সময় তাঁহার চিত্ত স্থিরভাব ধারণ করিল। তিনি প্রণিপাত করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন।

উঠিবামাত্র তিনি পুনরায় সেই অপরিচিত উপাসককে দেখিতে পাইলেন! তিনিও পূজা সমাধা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন! বিমলার চিত্তসংযমের ক্ষমতা ছিল, তিনি চিত্ত সংযম করিলেন। ক্ষণেকমাত্র সেই উপাসকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিমলা অবনতমুখে মন্দির হইতে বাহির হইবার উদ্যম করিলেন।

যুবক কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। দুই দিনই সেই পরম সুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইলেন, দুই দিনই সুন্দরী একদৃষ্টে তাঁহার দিকে ক্ষণেকমাত্র চাহিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, এই রমণীর কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে; কিন্তু লজ্জায় অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল একবার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু অপরিচিতা তরুণী, ভদ্রকন্যার

সহিত কিরূপে বাক্যালাপ করিবেন? দুই দিনের কথা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ভাবিলেন—যদি আমি না জিজ্ঞাসা করি, বোধ হয়, কোন বিশেষ গূঢ় কথা অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে —বোধ হয়, যে কারণে রমণী মন্দিরে আসিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হইবে।

যুবক ধীরে ধীরে বিমলার নিকটে যাইয়া বলিলেন—ভদ্রে! অপরিচিত হইয়াও আপনার সহিত কথা কহিতেছি, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনার কিছু বক্তব্য আছে—যদি থাকে—আজ্ঞা করুন।

বিমলার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল, তাঁহার শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, বিমলা মুখ অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবক দেখিলেন, কোন উত্তর নাই, অথচ রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভদ্রে! আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, বলুন, আমি শুনিতেছি—এখানে আর কেহই নাই।

বিমলার বিহ্বলতা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

আপনার নাম কি?

যুবক উত্তর করিলেন—নাম এক্ষণে অজ্ঞাত থাকিবে, আমাকে অধুনা ইন্দ্রনাথ বলিয়া জানিবেন।

বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার মহেশ্বর মন্দিরে উপাসনার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

ইন্দ্রনাথ। সংক্ষেপে বলিতেছি—কোন অনাথা, আশ্রয়-হীনা স্ত্রীলোকের সাহায্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

বিমলা। ধনদ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে?

ইন্দ্রনাথ। না; কিন্তু আপনাকে অপরিচিতের উপকারার্থ তৎপর দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন।

বিমলা। তবে কিরূপে সাহায্য হইবার সম্ভব?

ইন্দ্রনাথ। বিচার। আমি মুঙ্গের যাত্রা করিয়া বিচার প্রার্থনা করিব। কিন্তু আপনি এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

বিমলা মুঙ্গের নাম শুনিয়া পিতার কথা স্মরণ করিলেন, পিতার বিপদ্ স্মরণ করিলেন, তখন লজ্জা একেবারে দূরীভূত হইল। সজল নয়নে ইন্দ্রনাথকে বলিলেন—আপনি বোধ হয় বীরপুরুষ, আপনার ক্ষমতা অপার, প্রতিজ্ঞা করুন, দাসীর একটী ভিক্ষা প্রতিপালন করিবেন।

ইন্দ্রনাথ। রমণি! আমার ক্ষমতা নাই; কিন্তু সাধ্যমতে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান্ হইব; আজ্ঞা করুন।

বিমলা। মুঙ্গেরে আপনি বঙ্গদেশের দেওয়ান সতীশচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন। তিনি এক্ষণে বিপদ্ জালে বেষ্টিত, প্রতিজ্ঞা করুন, তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

ইন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হইল, ললাট কুঞ্চিত হইল। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন—

এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করিতেছেন কেন? বিপন্নের বিপদ্ শান্তি করাই বীরপুরুষের কার্য্য, আর যদি কখন তাঁহাকে অসৎ লোক বলিয়া শুনিয়া থাকেন, সে জঘন্য মিথ্যা কথা—শকুনির প্রতারণা।

ইন্দ্রনাথ। আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন, শকুনি কে?

বিমলা। শকুনি সতীশচন্দ্রের শম্নি। সেই পামরই সকল দোষে দোষী, সতীশচন্দ্রের উদার চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে না। বীরপুরুষ! এই দেবালয়ে অঙ্গীকার করুন, আপনি সতীশ-চন্দ্রের সহায় হইবেন।

ইন্দ্রনাথ এই সকল কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন, কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন—যদি যথার্থই সতীশচন্দ্র নির্দোষী হয়েন, তবে আমি নিজ শোণিত দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনার নাম কি বলুন। আপনি কে, কিরূপেই বা আমার উপাসনা, আমার প্রতিজ্ঞার কারণ জানিতে পারিলেন?

বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—আপনার উদ্দেশ্য আমি জানি না, কিন্তু আপনি কোন মহৎ বীরপুরুষ, মুঙ্গেরে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে যাইতেছেন, আমার হৃদয় আমাকে বলিতেছে। আপনার পরিচয়ও কিছু পাইতে ইচ্ছা হইতেছে।

ইন্দ্রনাথ। আমার পরিচয় এই পর্য্যন্ত জানিবেন, আমি কোন কায়স্থ জমীদারের সন্তান, যুদ্ধ-ব্যবসায় শিখিবার জন্য মুঙ্গের যাইতেছি।

ব্রাহ্মণকুমারী নিস্তব্ধে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিত নৌকাস্বামী।

How he heard the ancient helmsman
Chant a song so wild and clear,
That the sailing sea-bird slowly
Poised upon the mast to hear.
Till his soul was full of longing,
And he cried with impulse strong,—
"Helmsman! for the love of heaven,
Teach me, too, that wondrous song!"

Longfellow.

গঙ্গানদীর উপর মুঙ্গেরের ভীমকান্ত দুর্গ শোভা পাইতেছে। কল কল শব্দে গঙ্গার তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে, এক এক বার দুর্গের উপর বলে আঘাত করিতেছে, আবার ফেনময় হইয়া দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও তীরের মৃত্তিকারাশি সশব্দে জলে পতিত হইতেছে, বারিরাশি কিঞ্চিন্মাত্র কলুষিত ও চঞ্চল হইয়া পুনরায় মুহূর্ত্তমধ্যে আপন গম্ভীর রূপ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে শুভ্র বালুকার চর দেখা যাইতেছে, সেই চরে নানাপ্রকার পক্ষী

বিচরণ করে। কোথাও বা তরীবাসীগণ অবতরণ করিয়া সায়ংকালের ভোজ্য পাক করিতেছে, সেই তরী হইতে অসংখ্য দীপ তারকাজ্যোতিঃরূপে বহির্গত হইয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। আকাশেও ক্রমে ক্রমে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, গঙ্গাতীরে দুই এক জন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে, নগর ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে।

সেই গঙ্গাতীরে একজন যুবাপুরুষ একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ অদ্যই মুঙ্গেরে পঁহুছিয়াছেন, চিন্তায় মগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন।

ইন্দ্রনাথ কি করিতে মুঙ্গেরে আসিয়াছেন? সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা-সাধন জন্য! সত্য, কিন্তু সে প্রতিহিংসা কিসে সাধন হইবে? আপনি আশ্রয়হীন, সহায়হীন, সম্পত্তি হীন, অপরিচিত লোক হইয়া কিরূপে সে প্রতিহিংসা সাধন করিবেন? রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে আছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলে হয় না? রাজা টোডরমল্ল এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে মগ্ন, এক্ষণে কিরূপে তিনি অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন? বঙ্গদেশ এখনও জয় করিতে পারেন নাই, কিরূপে বঙ্গবাসীদিগের ন্যায় অন্যায় বিচার করিবেন?

আর যদিই বা সে বিচার করিতে এক্ষণে সক্ষম হয়েন, অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? মান্যবর দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে একজন অপরিচিত জমীদারপুত্র যাহা বলিবেন তাহা কি বিশ্বাসনীয়? রাজা টোডরমল্ল বিচার

করিতে সম্মত হইলেও ইন্দ্রনাথ এমন প্রমাণ কোথায় পাইবেন যে সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ হইবে?

আর সহসা দোষারোপ করা কি উচিত? মহেশ্বর-মন্দিরে অপরিচিতা রমণী যাহা বলিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। সে রমণী যে মিথ্যা বলিয়াছেন তাহাও বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার কথা যদি সত্য হয়, তবে সতীশচন্দ্র নিরপরাধী। নিশ্চয় না জানিয়া কি সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ করা উচিত?

আর সেই রমণী যাহার নাম করিয়াছিল, সে শকুনিই বা কে? ইন্দ্রনাথ যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই অধিকতর ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সেই তীরে উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন—এক্ষণে কোন উপায় দেখিতেছি না; মুঙ্গেরে কিছুদিন অবস্থান করা যাউক, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিব।

সহসা এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতে ইন্দ্রনাথের চিন্তা ভঙ্গ হইল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির চন্দ্রালোকোজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে একটী ক্ষুদ্র তরী ভাসমান রহিয়াছে, তাহার একমাত্র আরোহী সেই গান করিতেছে। গান বিশেষ মধুর কি না জানি না, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কর্ণে স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইল।

সেই গান একবার, দুইবার, তিনবার গীত হইল। গঙ্গার অনন্ত গীতের সহিত মিলিত হইয়া বায়ুপথে সঞ্চরণ করিতে

লাগিল। ক্রমে ভাসিতে ভাসিতে সেই নৌকা ইন্দ্রনাথ যে স্থানে ছিলেন তাহারই নিকটে আসিল, ইন্দ্রনাথ দেখিলেন নৌকার উপর একজন ভদ্রলোক একাকী স্বহস্তে নৌকা বাহিতেছেন ও আপন মনে গান করিতেছেন

সেই ভদ্রলোককে দেখিয়া ও তাঁহার গান শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল। প্রথমে তাঁহাকে মুঙ্গের সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও আগ্রহের সহিত উত্তর দিলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইল।

তখন ইন্দ্রনাথ বলিলেন—

মহাশয়! যদি অনুমতি দেন তবে আমি আপনার নৌকায় যাইয়া আমিও একবার চন্দ্রালোকে দাঁড় বাহিব, এবং আপনার অপূর্ব্ব গান আর একবার শুনিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিব।

নৌকারোহী উত্তর করিলেন—আপনার ন্যায় লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া আমারই ভাগ্য, আসুন, নৌকায় আরোহণ করুন; আর যদি হতভাগ্যের গানে রুচি হয় শ্রবণ করুন।

আবার নৌকা বাহিত হইল, আবার সুন্দর খেদপূর্ণ গীতে নৈশগগন পূর্ণ হইল।

অনেকক্ষণ পর নৌকাস্বামী ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় মুঙ্গেরে কবে আসিয়াছেন?

ইন্দ্রনাথ। আমি অদ্যই আসিয়াছি।

নৌকাস্বামী। আপনার নাম কি? নিবাস কোথায়?

ইন্দ্রনাথ। আমাকে ইন্দ্রনাথ বলিয়া জানিবেন, নিবাস অনেক দূরে, নদীয়া জিলায়।

নৌকাস্বামী। নদীয়া জিলার কোন গ্রামে?

ইন্দ্রনাথ। ইচ্ছাপুর গ্রামে।

নৌকাস্বামী। ইচ্ছাপুর গ্রামে? আপনি কাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

ইন্দ্রনাথ। কেন, আপনি ইচ্ছাপুরে গিয়াছিলেন না কি?

নৌকাস্বামী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন—আমায় কার্য্যবশতঃ সকল স্থানেই যাইতে হয়, আপনার পিতার নাম কি? হইতে পারে, আমি তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারি। ইন্দ্রনাথ আপন পরিচয় সকলের নিকট লুকাইয়া রাখিতেন, গুপ্তভাবেই দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিতেন, কিন্তু ইঁহার নিকট পিতার নাম লুকাইবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, আমি অনেক দিন পিত্রালয় হইতে আসিয়াছি, যদি এই ভদ্রলোক সম্প্রতি সে গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার পিতার কুশল-সংবাদ দিলেও দিতে পারেন। বলিলেন—ইচ্ছাপুরের জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমার পিতা। অপরিচিত ভদ্রলোক শুনিয়া সহসা চমকিত হইলেন। হস্তদ্বারা নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া বলিলেন—হা নগেন্দ্রনাথ! পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ!

পরে চিত্তসংযম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার নাম কি ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্রনাথ তখন বলিলেন—ইন্দ্রনাথ আমার কখনই নাম নহে, চিরকালই আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ; তবে অজ্ঞাত রূপে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতে হয়, এই জন্য মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করি।

"সুরেন্দ্রনাথ!" এই কথামাত্র উচ্চারণ করাতে অপরিচিতের চক্ষে জল আসিল, আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

ক্ষণেক পর বলিলেন—আমার বাল্যাবস্থায় পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথের বাটীতে কিছু কাল ছিলাম, সেই হেতু আপনাকে শৈশবাবস্থায় আমি দেখিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার পূর্ব্ব বন্ধুর সংসারের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। নগেন্দ্রনাথ ভাল আছেন?

ইন্দ্র। আছেন।

নৌ। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এক্ষণে কোথায়?

ইন্দ্র। আমার জ্যেষ্ঠের অনেক দিন কাল হইয়াছে।

নৌ। তাঁহার নাম উপেন্দ্রনাথ ছিল না?

ইন্দ্র। হাঁ।

নৌ। তাঁহার কাল হয় কিরূপে?

ইন্দ্র। ইচ্ছাপুরে বড় ব্যাঘ্রের ভয়, আমার জ্যেষ্ঠকে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। আমার জ্যেষ্ঠকে প্রায় স্মরণ নাই; অনেক বৎসর হইল তাঁহার কাল হইয়াছে।

নৌ। মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?

ইন্দ্র। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন, সেই দুঃখে তাঁহার রোগ হয়, সেই রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

প্রায় এক দণ্ড কাল কেহ কথা কহিলেন না, এক দণ্ড কাল নৌকা জলে ভাসিতে লাগিল, এক দণ্ডকাল পর ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, দর বিগলিত অশ্রুধারায় অপরিচিতের মুখমণ্ডল, বক্ষঃস্থল ও সমস্ত বস্ত্র সিক্ত হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন।

নৌকা প্রায় এক ক্রোশ ভাসিয়া গেল, গঙ্গার জল উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, আকাশে দুই এক খণ্ড শুভ্র মেঘ দেখা যাইতেছে, কখন কখন চন্দ্রকে ঈষৎ আবৃত করিতেছে, আবার বায়ুতে তাড়িত হওয়াতে চন্দ্রের পূর্ণ জ্যোতিঃ নদীর প্রশান্ত বক্ষে পতিত হইতেছে। আকাশ গভীর নীলবর্ণ, দুই একটা তারা লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় কখন কখন মুখ দেখাইতেছে। জগতে সমস্ত জীব নিস্তব্ধ, কেবল কখন কখন দূর হইতে একটা গীত বায়ুমার্গে ভাসিয়া আসিতেছে, আর সেই বিস্তীর্ণ গঙ্গা-বারিতে ও পার্শ্বস্থ শুভ্র সৈকতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গঙ্গায় আর একখানি নৌকাও চলিতেছে না। কেবল সুরেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র তরী তর তর্ শব্দে ভাসিতেছে।

যাইতে যাইতে তীর হইতে একটা আলোক দৃষ্ট হইল। তখন অপরিচিত নৌকারোহী সেই আলোক দেখাইয়া ধীর স্বরে বলিলেন—ঐ আমার গৃহ, আর উহার অনতিদূরে যে নিকুঞ্জ দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমার হৃদয় সংস্থাপিত আছে।

নৌকাস্বামীর গম্ভীর ভাবে চমকিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন তাঁহার চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু টল্ টল্ করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হইল। স্নেহপূর্ব্বক সেই জল মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বন্ধু আপনার নাম আমি জানি না, আপনার কার্য্য জানি না, কিন্তু তথাপি আপনাকে বন্ধু বলিয়া, ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইতেছে। বন্ধুর নিকট, ভ্রাতার নিকট, মনের

দুঃখ খুলিয়া বলুন, যদি আমার সাধ্য থাকে আপনার দুঃখ মোচন করিব।

নৌকাস্বামী উত্তর করিলেন—যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, অনুগ্রহবোধে আমার কুটীরে আসুন, আমি সমস্ত কথা আপনাকে নিবেদন করিব।

সুরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। তরী তীরে লাগিল। দুইজনে নিঃশব্দে সেই তরীচালকের ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিলেন।
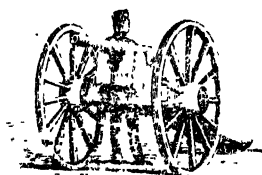
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নৌকাস্বামীর পূর্ব্বকথা।

How sweet the days that I have spent
  In yon sequestered bower:
Those citron trees, still sweet of scent,
  Had then some magic power.
Or some fair spirit did reside,
  In that sweet purling brook,
Which runs by yon green mountain side,
  Now haunted by the rook.
No charm was in the spicy grove,
  No spirit in the stream,
O'twas the smile of her I love,
  Now vanished like a dream!

I. C. Dutt.

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন বন্ধুর কুটীরে আসিলেন। দেখিলেন, কুটীর ক্ষুদ্র কিন্তু ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বাহিরে একটী ক্ষুদ্র বাগান আছে, তাহাতে কয়েকটী ফল বৃক্ষ আছে, নিকটে একটী গ্রাম আছে, সম্মুখে অনন্ত নদী, পশ্চাতে সুন্দর কুঞ্জবন ও ধান্য ক্ষেত্র। এই কুটীরস্বামী মুঙ্গেরে সামান্য কার্য্য

করিতেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চিন্তা ও খেদপরায়ণ হওয়ায় নগর হইতে দূরে একটী গ্রামের নিকট বাটী করিয়াছিলেন, তথায় একাকী থাকিতেন, একাকী গীত গাইতেন, এবং সায়ংকালে একাকী আপন নৌকা আপনি নদীবক্ষে বাহিতেন। উভয়ে উপবেশন করিলে পর সেই অপরিচিত সুরেন্দ্রনাথকে বলিতে লাগিলেন,—

"যুবক! আপনার হৃদয়ে যদি ক্রোধ ও দর্প থাকে, তাহা ত্যাগ করুন—এই দর্পেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শৈশবাবস্থা হইতে আমি অতিশয় গর্ব্বী ছিলাম। শুনিয়াছি, অতি শৈশবেও আমার কোন বিষয়ে ইচ্ছা যদি সম্পন্ন না হইত, তাহা হইলে আমি এক দিন, দুইদিন অনাহারে থাকিতাম। এই বিজাতীয় ক্রোধেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

"বাল্যাবস্থায়ও এইরূপ ছিলাম। আমার মন স্বভাবতঃ পাঠাভ্যাসে রত হইত, কিন্তু কখন যদি গুরুমহাশয় অন্যায় তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে আমার সেই বিজাতীয় ক্রোধের আবির্ভাব হইত, পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিতাম, সহস্র বেত্রাঘাতেও আমি কথা কহিতাম না, ক্রন্দন করিতাম না। গুরুমহাশয় আমাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে আমার ক্রোধ দেখিয়া আমার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন। একদা এরূপ রুষ্ট হইয়া আমাকে সহস্র যাতনা দিলেন, আমি ক্রন্দন করিলাম না, মুহূর্ত্তমধ্যে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তখন গুরু মহাশয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া ক্রোড়ে করিলেন, জলসেচনের দ্বারা আমাকে শীঘ্রই চেতনা দান করিলেন। সেই অবধি আমার পড়া সাঙ্গ

হইল। গুরুমহাশয় আর আমাকে পড়াইলেন না, আমি জন্মের মত মূর্খ রহিলাম।

"আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে কখন নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাই। তিনি আমার হৃদয় জানিতেন ও আমাকে এরূপ ভাল বাসিতেন যে, কখনও তাঁহার একটী কথাতেও মনে বেদনা জন্মে নাই। আমি পিতার অবাধ্য হইয়াছি, গুরুর অবাধ্য হইয়াছি, কিন্তু কস্মিন্‌কালেও মাতার একটী কথা অবহেলা করি নাই গৃহের সমস্ত লোকে উপরোধ করিলে, ভয় প্রদর্শন করিলে, প্রহার করিলে, আমি যে কার্য্য না করিতাম, মাতা ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই আমি তাহা করিতাম। হায়! সে স্নেহের প্রতিমাকে আমি আর দেখিতে পাইব না।" বলিতে বলিতে বক্তার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, মুখ নত করিয়া তিনি অনবরত অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, আপনার মাতার কাল হইয়াছে?

অপরিচিত উত্তর করিলেন—শুনিয়াছি তাঁহার কাল হইয়াছে।

ক্ষণেক অশ্রু বিসর্জ্জনের পর হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"আমার পিতা দেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমীদার ছিলেন, তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা, লোকজন, এবং সৈন্যসামন্ত ছিল, এবং স্বভাবতঃ তিনি কিছু গর্ব্বিত ও রুষ্ট ছিলেন। আমাকে যথার্থ ভাল বাসিতেন, আমার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার লোচন আনন্দে উৎফুল্ল হইত, আমার নিন্দা শুনিলে

তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া যাইত; তিনি সর্ব্বদা স্বাভাবিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। একদিন আমাকে নির্দ্দোষে প্রহার করিলেন ও বলিলেন, 'তোর মুখ আর দেখিতে চাহি না, আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যা।' 'চলিলাম,' বলিয়া আমি পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলাম।

"প্রহারে ও তিরস্কারে অনেক বালক শান্ত হয়, কিন্তু আমি ক্রোধে অন্ধ হইলাম; হৃদয়ে হুতাশন জ্বলিতে লাগিল। সেই হুতাশন পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ, সকলই দগ্ধ করিল, সেই হুতাশন আমার ভাবী সংসার-সুখ, পিতামাতার আশা ভরসা একেবারে দগ্ধ করিল। পিতা আমাকে দূর হইতে বলিলেন, আমি দূর হইলাম। সেই অবধি আমি পিতৃগৃহ ত্যাগী করিয়াছি। তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

"তাহার পর কয়েক বৎসর আমার জীবন যে কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। মরুভূমিতে প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় আমার জীবনের দশ বৎসর বহিতে লাগিল। প্রচণ্ডতা আছে, কিন্তু ফল নাই, অর্থ নাই, কাহারও উপকার নাই। নির্জ্জন প্রাণিশূন্য পর্ব্বতপার্শ্বে সমুদ্রগর্জ্জনবৎ আমার হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি সমুদয় গর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু সে গর্জ্জনের শ্রোতা নাই; সে গর্জ্জনে কেহ আনন্দিত হয় নাই, কেহ বিস্মিত হয় নাই। পাতাল-প্রবাহিনী, ভৈরবকল্লোলিনী ভোগবতীর তরঙ্গমালার ন্যায় আমার হৃদয়কন্দরে কত প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সে প্রবাহ ভোগবতীর ন্যায় মনুষ্যের অদৃশ্য, অন্ধকারাচ্ছন্ন।

"দশ বৎসর অতীত হইলে সেই অন্ধকাররাশি সহসা

আলোকচ্ছটায় চমকিত ও উদ্দীপ্ত হইল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বক্তা ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিস্পন্দনেত্রে সেই অপূর্ব্ব উন্মত্তপ্রায় লোকের দিকে দেখিতে লাগিলেন, অনন্যমনে তাহার উন্মত্ততার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনিও ক্ষণেক পর আরম্ভ করিলেন—

"যে সকল প্রবৃত্তিতে আমার হৃদয় দশ বৎসর কাল ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রেম সর্ব্বাগ্রগণ্য। (সুরেন্দ্রনাথ অধিকতর আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন)। সামান্য স্ত্রীলোকের প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম না, যে প্রেম মানব-হৃদয়কে একেবারে পরিপূর্ণ করিতে পারে, যে প্রেম জীবনের অংশস্বরূপ, দেহের আত্মা স্বরূপ, যে প্রেম শেষ হই-লেই জীবন শেষ হয়, সেইরূপ প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করি-তাম। কতবার অন্ধকারে বসিয়া সেই প্রেমের কল্পনা করিতাম; চিন্তাবলে কতবার শূন্য হইতে অলৌকিক স্নেহসম্পন্না প্রেম-প্রতিমাকে জাগরিত করিয়া, তাঁহারই সহিত কালহরণ করি-তাম! সহসা সে সুন্দর মূর্ত্তি জলবিম্বের ন্যায় ভিন্ন হইয়া যাইত; কল্পনাশক্তি শ্রান্ত হইত; আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতাম।

"দিন দিন এইরূপ কল্পনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবাকালে অর্দ্ধেক সময় আমি এজগতে থাকিতাম না, কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতাম। সে জগতে উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল ক্ষেত্র-বৃক্ষ, উজ্জ্বল অট্টালিকা, উজ্জ্বল গৃহদ্রব্যাদি—তন্মধ্যে সেই উজ্জ্বল প্রেমপ্রতিমা আসীন রহিয়াছেন। নিবিড় কৃষ্ণকেশে

জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণকান্তি মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, বালিকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুটী অল্প প্রেমহাস্যে বিস্ফারিত, ভ্রমর-কৃষ্ণ চক্ষু দুটী প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল প্রেমে ঢলঢল করিতেছে। সহসা কল্পনাশক্তি ছিন্ন-তার বীণাসম নীরব হইত। আমিও মূর্চ্ছিত হইতাম।

"একদিন নিশাবসানে কল্পনা ঐরূপ ছিন্ন হওয়াতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া এই গঙ্গাতীরে ঐ নিকুঞ্জবনে শুইয়া রহিয়াছি। কতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিলাম বলিতে পারি না, বোধ হইল, মস্তকে ও মুখে কে জলসিঞ্চন ও ব্যজন করিতেছেন। ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি—আপনি বিশ্বাস করিবেন না—সেই প্রেমপ্রতিমা! সেই স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার মুখে জল দিতেছে!"

উভয়েই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্ষণেক পরে সেই অপরিচিত লোক আবার বলিতে লাগিলেন--

"সুরেন্দ্রনাথ! আমি আর অধিক কথা কহিতে পারি না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সেই বালিকা কায়স্থকন্যা, অবিবাহিতা, অনাথা, এবং জ্ঞাতির অন্নে পালিতা। আমি বালিকার পাণিগ্রহণ করিলাম, তাহার পর কয়েক বৎসর যেরূপ সুখস্বপ্নে অতিবাহিত হইল, তাহা বর্ণনার অতীত।

"ঐ যে নিকুঞ্জবন দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমরা বাস করিতাম! শরৎকালের ঊষা আকাশে যে পবিত্র বর্ণ বিস্তীর্ণ করে, প্রেম আমাদের হৃদয়-আকাশে তদপেক্ষা পবিত্র বর্ণে চিরকালই রঞ্জিত হইয়া থাকিত। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার যেরূপ শান্ত ও

নিস্তব্ধ, আমাদের হৃদয়ে প্রেম তদপেক্ষা নিস্তব্ধ ও শান্তভাবে বিরাজ করিত। আমি সে রমণীকে কুঞ্জবাসিনী বলিতাম, কেননা ঐ যে কুঞ্জবন দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থানে"—

আর কথা সরিল না। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন অপরিচিত উন্মত্তের ন্যায় সেই কুঞ্জবনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন---মুখে কোন ভাবই নাই, সংজ্ঞার কোন লক্ষণ নাই। সুরেন্দ্রনাথ অনেক যত্নে তাঁহাকে চৈতন্যদান করিলেন। পরে অন্য কথা কহিতে কহিতে রাত্রি অনেক হইল। দুই ভ্রাতার মত দুই জন এক শয্যায় শয়ন করিলেন, অচিরে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্গবিজেতা।

A combination and a form indeed
Where every god did seem to set his seal
To give the world assurance of a man.

Shakespeare.

মুঙ্গেরের প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে একটী প্রশস্ত গৃহে এক বীর-পুরুষ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল।

তাঁহার নিকটে সে সময়ে অধিক লোক নাই, দুই চারি জন অতি বিশ্বাসী যোদ্ধা আসীন ছিলেন। অতি মৃদুস্বরে যুদ্ধের পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময় একজন সৈনিক আসিয়া প্রণিপাত করিয়া বলিল—

মহারাজ! একজন অশ্বারোহী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক, অনুমতির জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান আছে।

টোড। তাঁহার বক্তব্য কি জিজ্ঞাসা কর।

সৈন্য। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বলিলেন—মহারাজের সহিত দর্শন ভিন্ন বলিতে পারি না, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

টোড। হিন্দু কি মুসলমান?

সৈন্য। কায়স্থ জমীদার পুত্র।

টোড। বঙ্গদেশে অনেক পরাক্রান্ত কায়স্থ জমীদার আছেন, শুনিয়াছি তাঁহাদিগের আট লক্ষ সেনা আছে, সম্রাটের কার্য্যে তাঁহাদিগের সহায়তা আবশ্যক। আগন্তুককে আসিতে বল।

সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহীকে আনিতে যাইল।

এই অবসরে আমরা পাঠক মহাশয়কে রাজা টোডরমল্লের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ক্ষত্রিয়কুলাবতংস টোডরমল্ল অপেক্ষা সর্ব্বগুণবিভূষিত বীরপুরুষ কখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বহুপ্রসবিনী ভারতভূমিতে অনেক পুণ্যাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয়কুলে অনেক বীরপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এই তিন গুণেই বিভূষিত ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, ইতিহাসে তাঁহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা দিল্লীশ্বর আকবরসাহের সহিত পঞ্জাব গমন করিবার সময় দ্রুত ভ্রমণবশতঃ তাঁহার দেবারাধনা কার্য্যে বিঘ্ন হইয়াছিল। টোডরমল্ল প্রাতঃকালে দেবারাধনা না করিয়া কোন কর্ম্মই করিতেন না,

জলগ্রহণও করিতেন না। সুতরাং দেবারাধনার ব্যাঘাত হওয়াতে তিনি অনাহারে রহিলেন। আকবরসাহ অনেক অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে লওয়াইতে পারিলেন না। আবুল ফজেল প্রভৃতি আকবরের মুসলমান অমাত্যগণ টোডরমল্লকে গোড়া হিন্দু বলিয়া সততই নিন্দাবাদ করিত, কিন্তু মহানুভব দিল্লীশ্বর স্বধর্ম্মানুরাগী বীরকে সম্মান করিতেন। যখন টোডরমল্ল বৃদ্ধ হইলেন, যখন তাঁহার যশে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার পদ ও গৌরব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, তিনি সেই সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া গঙ্গাতীরে মানবলীলা সম্বরণ করিবেন, এই অভিলাষে দিল্লীশ্বরের অনুমত্যানুসারে রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বার গমন করেন।

ক্রমান্বয়ে তিনবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজা টোডরমল্ল সাহস ও যুদ্ধ কৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। প্রথম বার মনাইম খাঁর ও দ্বিতীয়বার হোসেনকুলীখাঁর অধীনে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারই সাহসে দুইবারই জয়লাভ হয়। তৃতীয়বার, তিনি স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে নহে, তিনি যেস্থানে যাইয়াছিলেন, সেই স্থানেই অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুজরাট প্রদেশে বিদ্রোহীদিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে টোডরমল্ল সিংহের মত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধোলকার-যুদ্ধে সেনাপতি মিজারখাঁ পলায়ন-তৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা টোডরমল্ল তাঁহাকে নিষেধ করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ করিলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী অগত্যা তাঁহারই

অঙ্কশায়িনী হইলেন। আকবরসাহের অসংখ্য সেনাপতি ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে টোডরমল্ল অপেক্ষা কোন সেনাপতিই অধিক বীরত্ব ও সাহস দেখাইতে পারেন নাই।

আকবরসাহ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব-স্থিরীকরণ-ভার রাজা টোডরমল্লের উপর ন্যস্ত করেন। সেই দুরূহ কর্ম্ম তিনি যেরূপে সম্পন্ন করেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রাজা টোডরমল্ল লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা দারিদ্র্যজনিত যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াও শিশুকে অতি যত্নে লালন পালন করেন। শিশুও অল্প বয়সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রকাশ করেন ও প্রথমে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবশতঃ এই নীচ কর্ম্ম হইতে তিনি আকবরসাহের রত্নপরিপূর্ণ সভার মধ্যে প্রধান রত্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সৈনিক পুরুষ সেই অপরিচিত আগন্তুককে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। তিনি পাঠকের অপরিচিত নহেন। টোডরমল্ল জিজ্ঞাসা করিলেন—যুবক! তোমার নাম কি? যুবক উত্তর করিলেন—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী।

টোড। নিবাস কোথায়?

ইন্দ্র। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি ইচ্ছাপুর গ্রামে।

টোড। তোমার কত সৈন্য আছে?

ইন্দ্র। সম্রাটের কার্য্য ও দেশ সুশাসনের জন্য পিতার দুই তিন সহস্র পদাতিক সৈন্য বঙ্গদেশে আছে। কিন্তু আপাততঃ আমি একাকীই সম্রাটের কার্য্য সাধনার্থ বিহার প্রদেশে আসিয়াছি।

রাজা টোডরমল্ল কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে যুবকের প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যুবকের আকারে উদারভাব ভিন্ন কিছু মাত্র লক্ষিত হইল না। ক্ষণেক পর রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমার পিতা কি সম্রাটের কার্য্যে কিছু সেনা এই স্থানে পাঠাইতে পারেন নাই?

ইন্দ্র। প্রভুর আজ্ঞা পাইলে পাঠাইবেন। অধুনা অনুমতি হইলে আমি প্রভুর কার্য্য সাধনের আশা রাখি। এই বলিয়া কোষ হইতে একবার অসি বাহির করিয়া পুনরায় কোষে রাখিলেন।

সাদাকখাঁ নামক সেনাপতি বলিলেন—যুবক! তুমি যেরূপ অসি ধারণ করিলে, আমার বিশ্বাস, যুদ্ধে তোমার হস্তে অসির অপমান হইবে না।

তারসন খাঁ নামক অপর একজন সেনাপতি মৃদুস্বরে রাজাকে বলিলেন—মহারাজ! এ শত্রুদিগের গুপ্ত চর, ইহাকে জল্লাদহস্তে অর্পণ করুন।

রাজা টোডরমল্ল কাহারও কথায় উত্তর না দিয়া বার বার যুবকের উপর তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকৃতিতে বা মুখভঙ্গিতে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলেন না। বিশেষ পরীক্ষার জন্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন—তুমি একাকী আমাদের কার্য্য সাধনে আসিয়াছ, ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

ইন্দ্র। আমার একটী ভিক্ষা আছে, আপনাকে যদি প্রভুভক্তি প্রদর্শনে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবে সে ভিক্ষা চাহিব, এক্ষণে সে ভিক্ষা বৃথা হইবে।

টোড। শত্রুরা আমাদের সৈন্যমধ্যে বিদ্রোহ উত্থাপন করিবার জন্য অনেক চর প্রেরণ করিতেছে। তুমি তাহাদিগের একজন নহ, আমি কিরূপে জানিব?

ইন্দ্র। কায়স্থ জমীদার পুত্রের কথার উপর বোধ হয় আপান নির্ভর করিতে পারেন।

টোড। অনেক সময়ে অভদ্র লোকও ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করে; অনেক সময়ে ভদ্রবংশীয় লোক কপটাচারী হয়।

ইন্দ্র। মহারাজ! কপটাচরণ কখন করি নাই, আমাদের বংশে সে দোষ নাই। ক্রোধে ইন্দ্রনাথের স্বর বদ্ধ হইল।

টোড। তোমার কথা উদারচেতা বীরপুরুষের ন্যায়, কিন্তু অনেক সময়ে গভীর খলতা বাহ্যিক ঔদার্য্য অবলম্বন করে।

ইন্দ্রনাথের মুখ ক্রোধে রক্তিমা ধারণ করিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—যদি আপনার নিকট কপটাচরণ করিবার জন্য আসিয়াছি বিশ্বাস হয়, তবে বিদায় দিন, চলিয়া যাই।

টোডরমল্ল তুষ্ট হইলেন, ইন্দ্রনাথকে সম্মানপুরঃসর অশ্বারোহীর পদে নিযুক্ত করিলেন।
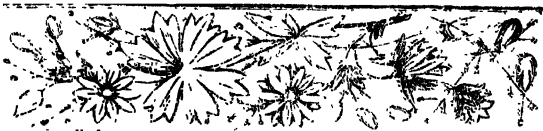
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুর স্মরণার্থ।

Alas! they had been friends in youth!

Coleridge.

কয়েক মাস বিগত হইল; ইন্দ্রনাথ ক্রমে যুদ্ধকার্য্যে নৈপুণ্য ও খ্যাতি লাভ করিলেন। বিদ্রোহীগণ ভাগলপুরে সমবেত হইয়াছিল, সুতরাং ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের মধ্য দেশে সর্ব্বদাই যুদ্ধাদি হইত।

একদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বিদ্রোহীগণ টোডরমল্লের দুর্গ প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। টোডরমল্ল তাহাদিগের উদ্দেশ্য পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং অনায়াসে তাহাদিগের চেষ্টা প্রতিরোধ করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তিনি দুর্গের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার উৎসাহে, তাঁহার বুদ্ধিবল ও রণকৌশলে, সৈন্যগণ প্রোৎসাহিত হইয়া

অনায়াসে শত্রুদিগকে সকলস্থানে পরাস্ত করিল। টোডরমল্ল ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্রনাথের সাহস ও যুদ্ধে উৎসাহ দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য সমস্ত দিন ইন্দ্রনাথ যেরূপ সাহসের সহিত শত্রুদিগের সহিত বার বার যুদ্ধ দান করিলেন, তাহাতে সেনাপতি যাহার পর নাই আনন্দিত হইলেন। সূর্য্যাস্তের সময় শত্রুগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ভাগলপুরের দিকে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পর ইন্দ্রনাথ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন টোডরমল্ল একাকী বিশ্রাম করিতেছেন, ইন্দ্রনাথকে আসিতে অনুমতি দিলেন।

ইন্দ্রনাথের অদ্যকার সাহসিক কার্য্য দেখিয়া টোডরমল্লের মন প্রফুল্ল হইয়াছিল, তিনি যুবা সৈনিককে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া নিকটে বসাইলেন। তাঁহাদের নিকটে তখন আর কেহ ছিল না।

তখন টোডরমল্ল বলিলেন।

ইন্দ্রনাথ! তুমি অদ্য যেরূপ বিক্রম দেখাইয়াছ, তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি। আজিকার যুদ্ধে তোমার জীবন সংশয়-স্থলে ছিল।

ইন্দ্র। মহারাজ! যে দিন সৈনিক হইলাম, সেই দিনই রাজকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, তবে যদি এ যুদ্ধের পরও জীবিত থাকি, তবে সে আপনার আশীর্ব্বাদে, আর পিতার পুণ্য বলে।

টোড। দেশে তোমার পিতা আছেন?

ইন্দ্র। আছেন।

টোড। তোমার ভ্রাতা ভগিনী কয়জন?

ইন্দ্র। আমার এক জন জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার কাল হইয়াছে। এক্ষণে আমিই পিতার একমাত্র সন্তান।

টোডরমল্লের মুখ গম্ভীর হইল। বলিলেন—যদি এই যুদ্ধে তোমার নিধন হয়, তবে তোমার পিতার কি মনঃপীড়া হইবে! আমারও পুত্র আছে, সেই জন্যই এই ভাবনা আসিতেছে। ধারীর বয়ঃক্রম তোমারই মত, তাহার সাহস তোমারই মত, তোমারই মত সে বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করে, মরণকে ভয় করে না। যদি সে যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহার পিতার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইবে। তথাপি রাজকার্য্যে মরণাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি আছে? সম্রাট্ আকবর সাহের কার্য্যে আমরা পিতা পুত্রে নিয়োজিত আছি; সে কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিতে আক্ষেপ নাই।

ইন্দ্র। বিধাতা সে দিন এখনও দূরে রাখুন; তাহার পূর্ব্বে প্রভু বহুদিন জীবিত থাকিয়া দিল্লীশ্বরের কার্য্য নির্ব্বাহ করুন, গৌরব ও খ্যাতি অর্জ্জন করুন। আপনার ন্যায় গৌরবান্বিত নাম ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে কাহারও নাই, আপনার ন্যায় গৌরবের কার্য্য কেহ সাধন করে নাই।

টোড। আমার অপেক্ষা গৌরবের কার্য্যে আমার জীবনের একজন বন্ধু প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। টোডরমল্ল এই কথা বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইন্দ্রনাথ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, টোডরমল্ল ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন—অদ্য আমার আনন্দের দিন, অদ্য যেরূপ শত্রু পরাস্ত হইয়াছে তাহা শুনিয়া দিল্লীশ্বর অতিশয় তুষ্ট হইবেন, কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে অদ্য আমার একটী দুঃখের কথা মনে

উদয় হইতেছে। এই মাসের এই দিনে আমার বাল্যকালের একজন পরম সুহৃদ্ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সে আজ ঠিক দ্বাদশ বৎসর হইল।

ইন্দ্র। সে মহাত্মাও বোধ হয় যোদ্ধা ছিলেন, তিনিও বোধ হয় দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন দান করিয়াছিলেন।

টোড। আশৈশব তাঁহার যুদ্ধ ভিন্ন অন্য ব্যবসা ছিল না, কিন্তু তিনি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন দান করেন নাই, দিল্লী-শ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জীবন দিয়াছেন।

টোডরমল্লের মুখে এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন, টোডরমল্ল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

দিল্লীশ্বরের পুরাতন দাসের নিকট দিল্লীশ্বরের শত্রুর প্রশংসা শুনিয়া তুমি চমকিত হইতেছ; কিন্তু তুমি যদি দিল্লীতে কখন গমন কর, স্বয়ং আকবর সাহের মুখে তাঁহার পরম শত্রু রাণা প্রতাপ সিংহের প্রশংসা শুনিয়া আরও চমকিত হইবে। ইন্দ্রনাথ! আকবরের কার্য্যে আমার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, আকবরের শত্রুই আমার শত্রু, কিন্তু তথাপি সাহস, অধ্যবসায় ও স্বদেশপ্রিয়তা দেখিলে কি শত্রু কি মিত্র সকলেই প্রশংসা করে। প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতায় যেরূপ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পর্ব্বত কন্দরে ও মরুভূমিতে বাস করিয়া বৎসর বৎসর আকবরের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ দান করিতেছেন তাহাতে আকবরসাহ স্বয়ং বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। আজি চারি বৎসর হইল প্রতাপ হলদীঘাটার যুদ্ধে অনেক সৈন্য হারাইয়াছেন, তাহার পর দুর্গ, ভূমি, সম্পত্তি, সমস্তই হারাইয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের পণ, মনুষ্যের সাহস ও অধ্যবসায়

হারান নাই। কন্দরবাসী প্রতাপ এখনও স্বদেশের জন্য যুঝিতে-ছেন, যত দিন জীবিত থাকিবেন যুঝিবেন। কি শত্রু কি মিত্র, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, এরূপ মুসলমান নাই, যে তাঁহারা সাধুবাদ করে না। ভারতবর্ষ আজ প্রতাপ সিংহের গৌরবে পূর্ণ।

ইন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। টোডরমল্ল ধীরে ধীরে বলিলেন—

কিন্তু প্রতাপসিংহের কথা আমি অদ্য চিন্তা করি নাই; আর একজন যোদ্ধা, যিনি দ্বাদশ বৎসর হইল সেই মেওয়ারের রাজধানী চিতোর রক্ষার্থ জীবন দান করিয়াছিলেন. তাঁহারই চিন্তা করিতেছিলাম। ইন্দ্রনাথ! অদ্য তোমার কার্য্য দেখিয়া আমি তুষ্ট হইয়াছি, যে কথা আমি সকলের সম্মুখে বলি না তাহা তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি। একটী গল্প শ্রবণ কর।

যৌবনের প্রারম্ভে আমি মেওয়ার দেশে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। একটী বরাহ শীকারে আমি প্রায় জীবন হারাইয়াছিলাম। একজন অসুরবীর্য্য যোদ্ধার অব্যর্থ বর্ষা-আঘাতে সে বরাহ হত হইল, আমি পরিত্রাণ পাইলাম। সেই অসুরবীর্য্য যোদ্ধা সূর্য্যমহল-দুর্গের তিলক সিংহ।

ক্রমে তিলক সিংহের সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য হইল, তখন তাঁহার অসাধারণ গুণ আমি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম, তিনিও আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমাদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব হইল!

জীবনের বন্ধুত্ব একবার হয়, দুইবার হয় না। ইন্দ্রনাথ! নারীর প্রণয়ের কথা তুমি অনেক পড়িয়াছ, অনেক শুনিয়াছ,

কিন্তু যৌবনে দুইজন সরলস্বভাব, উৎসাহপূর্ণ পুরুষের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হয় তাহা অপেক্ষা প্রকৃত প্রণয় আমি এ জগতে কিছুই জানি না।

যখন আমি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে ব্রতী হইলাম তখন তিলক সিংহকেও সেই কার্য্যে ব্রতী করিবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার ন্যায় রণপণ্ডিত ও অসুরবীর্য্য যোদ্ধা যদি দিল্লীশ্বরের কার্য্য স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে দিল্লীশ্বরের এরূপ সেনাপতি ছিল না যে তিলককে গুরু বলিয়া না মানিত। তিনি এত দিনে বঙ্গদেশ বা দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্ত্তা হইতেন।

কিন্তু তিলকসিংহ সে কার্য্যে ব্রতী হইলেন না। তিনি আমার প্রস্তাবে যে উত্তর দিলেন তাহা অদ্যাবধি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমার পিতা, আমার পিতামহ, আমার প্রপিতামহ মেওয়ারের রাণার কার্য্য করিয়াছেন, আমিও সেই কার্য্য করিব। দিল্লীশ্বর চিরকালই মেওয়ারের শত্রু, তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক নাই। অথবা শুনিয়াছি আকবর চিতোর অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন; যদি তিনি সেই উদ্যমে চিতোরে আইসেন তবে তিলকসিংহের সহিত তাঁহার একদিন সাক্ষাৎ হইবে।"

বীর যে কথা বলিলেন তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন দিল্লীশ্বর চিতোর আক্রমণ করিলেন তখন তিলকসিংহ সিংহ-বল প্রকাশ করিয়া চিতোর রক্ষার্থ জীবন দান করিলেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাহা দেখিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং আমাকে সে কথা বলিয়াছিলেন।

টোডরমল্ল অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে

বীর আকৃতি ম্লান হইল ; সেই যোদ্ধার গণ্ডস্থল দিয়া এক বিন্দু অশ্রু বহিয়া পড়িল। সে অশ্রু মোচন করিয়া টোডরমল্ল কহিলেন—

ইন্দ্রনাথ! প্রতাপসিংহ এক্ষণে আমাদের শত্রু। শুনিয়াছি তিলকের পুত্র তেজসিংহ* এখন প্রতাপ সিংহের অধীনে যুদ্ধ করিতেছেন, যদি দিল্লীশ্বর আমাকে মেওয়ারে প্রেরণ করেন তবে বন্ধুপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সঙ্কুচিত হইব না। তথাপি শত্রুরও যদি গুণ থাকে সে গুণ স্বীকার করা নিষিদ্ধ নহে, জীবনের পরম বন্ধু যদি বিধির বিড়ম্বনায় শত্রুপক্ষীয় হয়েন, তাঁহার মৃত্যুর জন্য এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করা নিষিদ্ধ নহে।

* যাঁহারা তেজসিংহের বীরত্বের কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা "জীবন-সন্ধ্যা" আখ্যায়িকা পাঠ করুন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অপরিচিত শত্রু ও পরিচিত বন্ধু।

PRISONER ! pardon youthful fancies ;
Wedded ? If you can say no !
Blessed is and be your consort :
Hopes I cherished, let them go !

Wordsworth.

টোডরমল্লের শিবির হইতে ইন্দ্রনাথ চিন্তা, বিস্ময় ও খেদ পূর্ণ হইয়া নিজ শিবিরে আসিলেন। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া মেওয়ার, প্রতাপসিংহ ও তিলকসিংহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া তিনি একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিলেন; মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল—

"তোমার বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষে যাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই, তুমি তাহার চক্ষে ধূলি দিয়াছ। আমরাও ঐ পথ অবলম্বন করিব, কেন না যে পতনোন্মুখ গৃহ অগ্রে ত্যাগ করে, সেই বুদ্ধিমান। অদ্য এক প্রহর রজনীতে শ্মশানঘাটে দেখা হইবে।"

ইন্দ্রনাথ এ পত্রের কিছুই অর্থগ্রহণ করিতে পারিলেন না। "ভারতবর্ষে যাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই"—সে কে? বোধ হয় রাজা টোডরমল্ল, কিন্তু তাহার চক্ষে ধূলা কে দিয়াছে? পতনোন্মুখ গৃহ কি? ইন্দ্রনাথের বোধ হইতে লাগিল যে, কোন বিদ্রোহীকর্ত্তৃক এই পত্র লিখিত হইয়াছে, শ্মশানঘাটে যাওয়া কি কর্ত্তব্য? ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যাওয়ায় কোন হানি নাই, বরং কোন গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ইন্দ্রনাথ নিরূপিত সময়ে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই, অসিই তাঁহার একমাত্র সহায়।

রজনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন, আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন! আকাশে কালো মেঘ উড়িতেছে; এক এক খানি করিয়া সেই মেঘ পশ্চিম দিকে রাশীকৃত হইতেছে; সেই পশ্চিম দিক্ হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে; বিদ্যুৎ-আলোকে শ্মশানের ভয়ানক বস্তু সকল এক এক বার দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে সম্প্রতি শবদাহ হইয়াছে, ভস্মরাশির মধ্যে অগ্নি এক এক বার দেখা যাইতেছে; কোন স্থানে বা উজ্জ্বল অগ্নিশিখা চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে নানারূপ ছায়া দেখা

যাইতেছে, নিকটস্থ বৃক্ষরাশির মধ্য দিয়া বায়ুবেগবশতঃ নানা-রূপ অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ-গোচর হইতেছে। সেই ছায়া দেখিয়া, সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রনাথের স্বাভাবতঃ সাহসী হৃদয়ও এক এক বার স্তম্ভিত হইতে লাগিল। কখন কখন তিনি দূরে যেন ভয়ানক আকৃতি দেখিতে লাগিলেন, সেই দিকে গমন করিয়া কখন বা দেখেন ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে, কখন বা বোধ হয় যেন সেই আকৃতি ধীরে ধীরে যাইয়া বৃক্ষের অন্ধ-কারে লীন হইতেছে। গগনমণ্ডল ক্রমশঃই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, বায়ু ক্রমশঃই ভীষণতর শব্দ করিয়া বহিতে লাগিল, গঙ্গার তরঙ্গ ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল। আকাশে নক্ষত্র মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, দূরে শিবাগণ মুহুর্মুহুঃ বিকট শব্দ করিতেছে, যেন দূর হইতে প্রেত ও পিশাচের অট্টহাসি শ্রুত হইতেছে।

যে দিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, সেই দিকে যেন বোধ হইল, দুইটা ভীষণ আকৃতি অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। ইন্দ্রনাথ তাহা প্রথমে গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু যতবার সেই দিকে নয়নপাত করেন, ততবারই সেই ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথ সেই দিকে আগমন করিলেন, বোধ হইল, যেন সেই আকৃতিদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইল। ইন্দ্রনাথ সে দিক্‌ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, বোধ হইল, যেন জঙ্গলের ভিতর হইতে অট্টহাসি শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া দেখি-লেন, সেই দুই ভীষণ আকৃতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

"ভগবান্‌ সহায় হউন!" এই কথা বলিয়া ইন্দ্রনাথ অসি-হস্তে ধীরে ধীরে সেই দিকে পুনরায় গমন করিলেন। অতিশয়

সতর্কতার সহিত আকৃতিদ্বয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গলের নিকটে আসিতে না আসিতে আবার সেই আকৃতিদ্বয় অদৃশ্য হইল। আবার দূর হইতে সেই পৈশাচিক অট্টহাস শ্রুত হইল।

"ভগবান্ সহায় হউন!" বলিয়া ইন্দ্রনাথ সেই জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেস্থানে এরূপ নিবিড় অন্ধকার যে চারি হস্ত দূরে কোনও দ্রব্যই লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়াছে; ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতেছে। সেই হাসির শব্দ লক্ষ করিয়া ইন্দ্রনাথ যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার শরীরের উপর যেন কে হস্ত স্থাপন করিল।

ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, প্রেত নহে, তাহারা দুই জন ছদ্মবেশী মনুষ্য। তাহারা ইঙ্গিত করিয়া ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিল। ইন্দ্রনাথ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই দুই জন মনুষ্যের সহিত তিনি অনেকক্ষণ নীরবে যাইতে লাগিলেন। চতুঃপার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল ও নিবিড় অন্ধকার; নিঃশব্দে তিন জনে সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহারা গঙ্গাতীরে এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় মুখমণ্ডল হইতে আবরণ খুলিয়া লইল, ইন্দ্রনাথ তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। তাহারা হুমায়ুন ও তর্খান নামক রাজা টোডরমল্লের অধীনস্থ দুই জন সেনাপতি।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—এত রাত্রে এই ভয়ঙ্কর-বেশে এস্থানে আপনারা কি করিতেছেন?

হুমায়ুন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—সেনানী ইন্দ্রনাথের সাহস পরীক্ষা করিতেছিলাম।

ইন্দ্রনাথ। আমি আপনাদিগের নিকট পরীক্ষা দিতে যদি অসম্মত হই?

হুমায়ুন। তাহা হইলে বোধ করিব, আমরা যে অসমসাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, সেনানী ইন্দ্রনাথ তাহা সমাধা করিতে অক্ষম।

ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ অক্ষম কি সক্ষম, কার্য্যকালে তাহা অন্য লোকে বিবেচনা করিবেন। শ্মশানভূমিতে পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিলে কি সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়?

হুমায়ুন। সেনানী ইন্দ্রনাথের যে অসাধারণ সাহস আছে, তাহা আমাদের শিবিরে অবিদিত নাই। তাঁহার পৈশাচিক সাহস আছে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলাম। পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পৈশাচিক সাহস আবশ্যক হয়।

ইন্দ্রনাথ। কি পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি?

হুমায়ুন। তাহা কি জানেন না? উপহাস করিতেছেন কেন? আপনি যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, আপনি গূঢ়মন্ত্রণায় ও চমৎকার কৌশলে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সে কার্য্য কি আপনি জানেন না? আপনার কৌশল ও বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, রাজা টোডরমল্লকে কেহ বঞ্চনা করিতে পারেন নাই, আপনি তাহা করিয়াছেন। আপনি চিরজীবী হউন, একদিন বঙ্গদেশের গৌরবস্থল হইবেন।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তর্খান বলিতে লাগিলেন—

যথার্থই হুমায়ুন ও আমি কতবার অন্তরালে আপনার কৌশলের ধন্যবাদ করিয়াছি। শিবিরে আমাদের মত অনেক জনই বিদ্রোহোন্মুখ সেনানী আছেন। ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি মাসুমী ফারাখুদীও বিদ্রোহতৎপর। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল আমাদিগের সকলের অন্তরের ভাব জানিয়াছেন, আমাদিগের সকলেরই উপর এরূপ দৃষ্টি রাখিয়াছেন যে আমরা কামনা সিদ্ধ করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনি কি কুহকে, কি মহাকৌশলে যে রাজা টোডরমল্লকে অন্ধ করিয়াছেন কিছুই বুঝিতে পারি না। ধন্য আপনার বুদ্ধিবল!

তর্খান আরও বলিতেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—আমি বিদ্রোহী নহি, আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন আমি গুপ্তচর, কি কপটাচারী, কি বিদ্রোহকামনা করিয়া রাজা টোডরমল্লের অধীনে কর্ম্ম করিতেছি, তাহা হইলে আপনারা ঘোর ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। আর আপনারা যদি বিদ্রোহী হয়েন, তবে আমাকে বিদায় দিন। আমার সহিত আপনাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। আমি এইক্ষণেই রাজা টোডরমল্লকে সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত করাইব। কুক্ষণে আমার হস্তে আপনাদিগের লিপি পড়িয়াছিল।

হুমায়ুন দিউয়ানা ও তর্খান ফার্মিলীর মুখ গম্ভীর হইল, উভয়েই ভাবিতে লাগিল—আমরা এতদিন কি ভ্রান্ত ছিলাম, মাসুমী ফরাখুদী কি এই হিন্দুর অন্তর বিশেষ জানেন না? উভয়েই কোষ হইতে খড়্গ বহির্গত করিবার উদ্যম করিলেন।

ইন্দ্রনাথও শস্ত্রবিষয়ে অপটু ছিলেন না, তিনিও কোষ হইতে অসি বহির্গত করিলেন। এমত সময়ে হুমায়ুন পুনরায় একটু হাসিয়া বলিলেন—

বুঝিয়াছি, আপনি বোধ হয়, এখনও আমাদিগকে বিশ্বাস করেন নাই, এই জন্য আমাদিগের নিকট বিদ্রোহ মন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে চাহেন না। কিন্তু আমাদিগের নিকট মন্ত্রণা গুপ্ত করিবার আবশ্যক নাই; আপনি একর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বাবধি আমরা বিদ্রোহোন্মুখ। এই দেখুন, বিদ্রোহীদিগের নিকট হইতে আমরা কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি।

ইন্দ্রনাথ ক্রোধে ও বিস্ময়ে অন্ধ হইলেন, বলিলেন—পামর মুসলমান! কাপুরুষ বিদ্রোহি! তোমাদের পাপের সমুচিত দণ্ড দিব।

হুমায়ুন ও ইন্দ্রনাথের মধ্যে অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দ্রনাথ হুমায়ুন অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন ও অল্পদিন মধ্যে চমৎকার অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে হুমায়ুনের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল; মূহূর্ত্তমধ্যে হুমায়ুন ভূতলশায়ী হইলেন।

যখন প্রথমে ইন্দ্রনাথ ও হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ হয়, তখন তর্খান কিছু দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রথমেই যুদ্ধ এরূপ ভয়ঙ্কর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল যে, তর্খান ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। যখন দেখিলেন, হুমায়ুন ভূতলশায়ী হইয়াছেন, তখন একেবারে লম্ফ দিয়া ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ ফিরিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে করিতে হুমায়ুন উঠিয়া পুনরায় অসি-

হস্ত হইলেন। সুতরাং দুই জনে একেবারে ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিলেন।

এবার ইন্দ্রনাথের বিষম সঙ্কট উপস্থিত। দুই জনের সহিত এক জনের অসিযুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষতঃ তর্খান ও হুমায়ুন অসিচালনে নিতান্ত অপটু ছিলেন না। কেবল হুমায়ুনের কাতরতা ও রজনীর অন্ধকার বশতঃই কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

হুমায়ুন ক্রমে অবসন্ন শরীর হইলেন, তর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিলেন। তর্খানও সেই অবসরে সতেজে আক্রমণ করিলেন। দুই জনের সমরকালীন আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ হঠাৎ পশ্চাৎ যাইবার মানস করিলেন। তখন তিনি গঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, লম্ফ দিয়া যেই পশ্চাতে যাইবেন, অমনি গঙ্গাসলিলে নিপতিত হইলেন! "মাতঃ পৃথিবী! এই বিপত্তিকালে তুমিও স্থান দিলে না" এইরূপ মনে ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাসলিলে মগ্ন হইলেন। তর্খান ও হুমায়ুন ইন্দ্রনাথের মৃত্যু স্থির করিয়া আপন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

হুমায়ুন ও তর্খান যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা বড় মিথ্যা নহে; ইন্দ্রনাথ যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতে উত্থান-শক্তি ছিল না। সন্তরণ করা দূরে থাক, উচ্চ পাড় হইতে পড়িয়া তিনি একেবারে অচেতন হইলেন। ভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তী ঘাটে এক খানি নৌকা বাঁধা ছিল এবং সেই নৌকায় একজন ভদ্রলোক জাগরিত ছিলেন। মনুষ্যকে জলে পড়িতে দেখিয়া তিনিও মাল্লাদিগকে জলে নামাইয়া মৃতপ্রায় ইন্দ্রনাথের প্রাণ

বাঁচাইলেন। মাল্লাগণ ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথকে নৌকায় দিকে লইয়া চলিলেন। শেষে ইন্দ্রনাথকে নৌকায় তুলিলেন।

যিনি মাল্লাদিগকে উঠাইয়া ইন্দ্রনাথের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন, তিনি রমণী। তিনি অতিশয় যত্নসহকারে ইন্দ্রনাথের শরীর ধৌত করিয়া দিলেন, তাহার পর সেই অস্ত্রাঘাত গুলি একে একে সিক্ত বস্ত্রের দ্বারা বাঁধিতে লাগিলেন, দেখিলেন যদিও অনেক স্থানে ক্ষত হইয়াছে তথাপি কোন ক্ষতই গভীর বা সাংঘাতিক নহে। তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল, সমস্ত রাত্রি উত্তম নিদ্রা হইলে প্রাতঃকালে শরীরে অধিক বেদনা থাকিবে না।

সমস্ত রাত্রি ইন্দ্রনাথের উত্তম নিদ্রা হইল। প্রাতঃকালে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, পার্শ্বে এক পরমা সুন্দরী রমণী বসিয়া রহিয়াছেন। ইন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন তিনি এই সুন্দরীকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন—

ভদ্রে! আপনি আমাকে প্রাণ দিয়াছেন, আপনি বোধ হয় আমাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনি কে? কি করিলে এ ঋণ শোধ করিতে পারিব? আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন জানিলে রাজা টোডরমল্ল কিছুই দিতে অস্বীকৃত হইবেন না।

রমণী অনেকক্ষণ উত্তর দিলেন না; ইন্দ্রনাথ বার বার প্রশ্ন করাতে অবশেষে বলিলেন—সৈনিকবর! আমাকে কি ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছেন?

সে কোকিলনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি ইন্দ্রনাথ এখনও ভুলেন নাই। উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন—

রমণীরত্ন! আমি জীবিত থাকিতে আপনাকে বিস্মৃত হইব না। আপনি কিরূপে এস্থানে আসিলেন? মহেশ্বর মন্দির কতদিন ত্যাগ করিয়াছেন?

সেই নৌকাবাসিনী রমণী বিমলা! ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে মহেশ্বর মন্দিরে দেখিয়াছিলেন, অদ্য এই স্থানে এই অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইন্দ্রনাথের বিস্ময় দেখিয়া বিমলা একটু হাসিলেন, অবগুণ্ঠন টানিয়া ধীরে ধীরে আহত সৈনিকের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন!

ইন্দ্রনাথ অনেকস্থানে আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু আঘাত গুরুতর নহে। বিমলা যত্নসহকারে আঘাতগুলিতে বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন; তৎপর ইন্দ্রনাথ প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন।

যাইবার সময় ইন্দ্রনাথ সেই রমণীকে শতবার ধন্যবাদ দিলেন, এবং কোনরূপ পুরস্কার গ্রহণ করিতে বার বার উপরোধ করিলেন।

বিমলা অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে সজল-নয়নে উত্তর করিলেন—সৈনিকবর! প্রভু! মহেশ্বর মন্দিরে আপনার নিকট একটী ভিক্ষা করিয়াছি, সতীশচন্দ্রের রক্ষা। তাহাই আমাকে পুরস্কারস্বরূপ দান করুন।

ইন্দ্রনাথ। কিন্তু সে ভিক্ষা নহে, সতীশচন্দ্র যদি নির্দ্দোষী হয়েন তবে তাঁহাকে রক্ষা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমি আপনার আর কি করিতে পারি আদেশ করুন, আমি পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি।

বিমলা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

আমার দ্বিতীয় ভিক্ষা এই—আপনি আমাকে মহেশ্বরমন্দিরে দেখিয়াছেন, মুঙ্গেরেও দেখিলেন, একথা বিস্মৃত হউন।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আপনি আজ আমাকে জীবন দান করিলেন, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। আপনার এ যাত্রা কি জন্য ?

বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—আমি ব্রাহ্মণ কুমারী, অতএব আপনার স্মরণ পথে থাকিবার অযোগ্যা। সরলা আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব অন্য নারী আপনার স্মরণ পথে থাকিবার অযোগ্যা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কমলা।

As in the bosom o' the stream,
 The moon-beam dwells at dewy e'en
So trembling, pure was tender love,
 Within the breast o' bonnie Jean.
And now she works her mammie's work,
 And aye she sighs with care and pain,
Ye wist na what her ail might be,
 Or what wad make her weel again.

Burns.

বিমলা কি জন্য মুঙ্গেরে গমন করিয়াছিলেন, জানিতে পাঠক মহাশয় উৎসুক হইবেন, কিন্তু সে কথা বলিতে হইলে আমাদের তাহারও পূর্ব্বকথা লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং ইন্দ্রনাথ যে মন্দিরে সরলাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই মন্দিরের কথা লইয়া আমরা আরম্ভ করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইচ্ছামতীতীরস্থ মহেশ্বর মন্দিরের

অনতিদূরে একটী গ্রাম ছিল, নাম বনগ্রাম। মন্দিরের মোহান্ত চন্দ্রশেখর প্রায়ই দেবালয়ে থাকেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এই পল্লী গ্রামে আসিয়া বাস করিতে ভাল বাসিতেন।

দেবালয়ের মোহান্ত সচরাচর যেরূপ স্বার্থপর ও বিষয়লুব্ধ হইয়া থাকেন, চন্দ্রশেখর সেরূপ ছিলেন না। তিনি অতিশয় নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন, ও অনেক অনাথা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে এই পল্লীগ্রামে রাখিয়া ভ্রাতাভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। দেবালয়ের কার্য্য অন্যান্য বিশ্বস্ত পূজকের হস্তে সমর্পণ করিয়া চন্দ্রশেখর আপন আশ্রিত কয়েক ঘর লোক লইয়া এই গ্রামে উপাসনা করিতে ভাল বাসিতেন, আবার আবশ্যক হইলে স্বয়ংও মহেশ্বরমন্দিরে কার্য্য করিতেন। কমলানাম্নী একটী অনাথা কায়স্থ কন্যাকে পরিচারিকারূপে গৃহে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতেন। চন্দ্রশেখর যেরূপ নির্ম্মলচরিত্র সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাকে দেখিলে পুরাকালের মুনিঋষির ন্যায় বোধ হইত, তাঁহার গ্রামটীকেও তিনি যথার্থই পুরাকালের আশ্রমের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শিষ্যগণ কথাচ্ছলে তাঁহাকে কণ্বমুনি, এবং তাঁহার পালিতা কমলাকে শকুন্তলা বলিত!

সায়ংকাল উপস্থিত। সেই সায়ংকালে দুই জন নদীতীরে আসীন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সরলা, অন্য কমলা।

কমলা অনেক দিন অবধি এই আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম উনবিংশ বৎসর মাত্র। তিনি কাহার দুহিতা, কাহার বনিতা, তাঁহার স্বামীর কতদিন মৃত্যু হইয়াছে, এ

সকল কথা কেহ জানিতেন না, জিজ্ঞাসা করিলে কমলা ক্রন্দন করিতেন, সুতরাং কেহ জিজ্ঞাসাও করিতেন না।

কমলার স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া আশ্রমবাসীগণ বিস্মিত হইতেন। কমলা সততই শান্ত, অন্যমনস্কা ও চিন্তাশীলা। যে স্থানে আশ্রমপাদপপুঞ্জ অতিশয় নিবিড় ও অন্ধকারময়, যেস্থানে মনুষ্যের শব্দমাত্র নাই, মধ্যাহ্নকালে গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া কমলা সেই নিভৃত স্থানে একাকী চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন, মধ্যাহ্নে অতি মৃদুনিঃস্থত পক্ষীর রব শুনিতে ভালবাসিতেন। যেখানে আম্রবৃক্ষের পদ প্রক্ষালন করিয়া ইচ্ছামতী কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইত, সন্ধ্যার সময় কমলা সেই স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন, নদীর অনন্ত কুল কুল ধ্বনি শুনিতে ভালবাসিতেন। সে অনন্ত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে কমলা যে অনন্ত চিন্তা করিতেন সে চিন্তা কিসের? কে বলিবে কিসের? চন্দ্রশেখর কমলাকে আপন গৃহে রাখিয়াছিলেন, আপন কন্যার মত যত্ন করিতেন, এবং গ্রামবাসিনী সকলেই কমলাকে ভালবাসিতেন এবং কমলার কথাবার্ত্তায় প্রীত হইতেন। সে কথাবার্ত্তা কি মধুর, কি ভাবপরিপূর্ণ! শ্রোতার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত।

কমলা নিরুপমা সুন্দরী। তাঁহার নয়ন দুটী অতিশয় শান্তজ্যোতিঃ ও চিন্তাপ্রকাশক, সমস্ত মুখখানি শান্ত ও গাঢ় চিন্তায় ম্লান। দেহ অতি সুকুমার, বিধবার মলিন বস্ত্রে সে সুকুমার দেহ আবৃত হইয়া শৈবাল-বেষ্টিত পদ্মবৎ শোভা পাইত। কিন্তু সে প্রস্ফুটিত পদ্ম নহে, সায়ংকালে মুদিত প্রায় পদ্ম যেরূপ জলহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকে,

কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সেইরূপ সততই চিন্তায় মগ্ন, লোকালয়ে সেইরূপ মুদিতপ্রায় হইয়া থাকিতেন। কমলা চন্দ্রশেখরকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন, চন্দ্রশেখরের গৃহকার্য্য সমস্ত তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন, কার্য্যে অবসর পাইলেই আবার সেই নিভৃত নিবিড় পাদপাবৃত স্থানে যাইতেন। শিখণ্ডিবাহন তাঁহাকে উপহাস করিয়া বনদেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তদনুসারে আশ্রমের অনেকেই কমলাকে বনদেবী বলিয়া ডাকিত। ফলতঃ তিনি যেরূপ একাকী বনে বনে বিচরণ করিতে ভালবাসিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সেই শান্ত পবিত্র ছায়ান্বিত আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বোধ করা কিছুই বিচিত্র নহে।

অদ্য সন্ধ্যার সময় কমলা সরলাকে লইয়া বনবিচরণ করিতে-ছিলেন, এক্ষণে দুই জনে নদীতীরে বসিয়া রহিয়াছেন। কমলা সরলাকে ভাল বাসিতেন, সে সরলচিত্ত বালিকাকে না ভালবাসিয়া কে থাকিতে পারে? সরলাও কমলার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেন, আপনার দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সেই বিধবার দুঃখে দুঃখী হইতেন। সুতরাং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, সরলার আবার দুঃখ কি? বালিকার হৃদয়ে চিন্তা কিসের? আমরা উত্তর করিব, সরলা আর বালিকা নাই, তাহার হৃদয়কোরকে প্রণয়কীট প্রবেশ করিয়াছে।

যেদিন হইতে ইন্দ্রনাথ সরলার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে প্রণয় কাহাকে বলে সরলা বুঝিল, চিন্তা কাহাকে বলে বুঝিল। সরলা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহময়ী

কন্যা, কিন্তু এক্ষণে মাতার সেবাশুশ্রূষা করিতে করিতে সততই আর একজনের কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত, আর একখানি মুখ মনে পড়িত। এখনও সরলা পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিত কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, মধ্যে মধ্যে সহসা চক্ষে জল আসিত। লজ্জায় অশ্রু মুছিয়া আবার কার্য্যে নিযুক্ত হইত, আবার ধীরে ধীরে চক্ষে জল আসিত। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে চক্ষুর্দ্বয় পরিপূর্ণ হইত, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে মুখখানি সিক্ত হইত।

চিন্তা কি? সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে পারিত না, কিন্তু আমরা অনুভব করিতে পারি। রুদ্রপুরে পূর্ণচন্দ্রালোকে যে দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম আবার কি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? যাঁহার কণ্ঠে লীলাক্রমে মালা দিতাম, তাঁহাকে কি আবার দেখিতে পাইব? যুদ্ধ হইতে ইন্দ্রনাথ আবার কি ফিরিয়া আসিবেন? এই চিন্তা করিতে করিতে সরলা কার্য্য কর্ম্ম ভুলিয়া যাইত, চারিদিক্ শূন্য দেখিত। জ্ঞানচক্ষে সেই রুদ্রপুরের কুটীর দেখিতে পাইত—সেই কুটীরের পার্শ্বে সেই উদ্যান—সে উদ্যানে সেই পুষ্পচারা, উপরে পূর্ণচন্দ্র—সেই পুষ্পচারার মধ্যে সেই চন্দ্রালোকে সেই হৃদয়ের ইন্দ্রনাথ—সহসা নয়নজলে সরলার মুখখানি প্লাবিত হইয়া যাইত।

মন্দিরবাসীদিগের মধ্যে একজন মাত্র সরলার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। কমলা সরলাকে কখন কখন আপনার সঙ্গে নিস্তব্ধ নদীকূলে অথবা সুস্নিগ্ধ ছায়াবৃত বৃক্ষতলে লইয়া যাই-

তেন, এবং আপনার চিন্তার ভাগিনী করিতেন, সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন, ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতেন। সরলা কমলার গল্প শুনিতে শুনিতে আপন দুঃখ ভুলিয়া যাইত, কমলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন দুঃখ দূর করিত। যেরূপ জনশূন্য স্থানে যাইতে তাহার ভয় করিত, চিন্তাশীলা কমলার সঙ্গে সে সকল স্থানেও যাইত, যেরূপ গভীর ভাবময় চিন্তা তাহার বালিকাহৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, ভাবিনী কমলার নিকট তাহাও শুনিত। ফলতঃ দুইজনে একত্র হইলে কমলা আপনার হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া বালিকার নিকট নানারূপ গল্প করিতেন ও অন্তরের নানারূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। সরলা বালিকার মত একমনে সেই সমুদয় শুনিত, সে ভাব তাহার বড় ভাল লাগিত, সে হৃদয়গ্রাহী কথা শুনিতে শুনিতে আপন দুঃখকথা বিস্মৃত হইত।

আজি সন্ধ্যার সময় তাঁহারা দুই জনে নদীতীরে বসিয়া আছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কে বল দেখি?

Manfred.—Oblivion, self-oblivion.

Byron.

কমলা ডাকিলেন—সরলা।

সরলা উত্তর না করিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ তোমাকে এত ম্লান দেখিতেছি কেন?

সরলা মুখখানি নত করিল

কমলা দেখিলেন আজ দুঃখবেগ প্রবল হইয়াছে। স্নেহ-সহকারে সরলার নিকটে বসিয়া সরলার হস্ত আপন হস্তে ধারণ করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন—

ভগিনি! পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষাও হতভাগিনী আছে। তোমার স্নেহময়ী মাতা আছেন, জগৎসংসারে থাকিবার স্থান আছে, হৃদয়েশ্বর জীবিত আছেন, তোমার আশা-ভরসা সকলই

আছে। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ হতভাগিনী আছে যাহার কিছুমাত্র নাই, যাহার ভবিষ্যতের আশা নাই, অতীতের স্মৃতি নাই, কেবল অতুল চিন্তাজলে ভাসিতেছে।

সরলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল, বলিল—দিদি, তোমার কথা ভাবিলে আমি আপন দুঃখ ভুলিয়া যাই।

কমলা। বিধাতা সহ্য করিবার জন্যই নারীজন্ম দিয়াছেন। পুরুষে যত সহ্য করিবে, আমরা তাহার দশ গুণ সহ্য করিব।

সরলা। যদি না পারি?

কমলা। তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিলে কেন? দেখ, মনুষ্যের মানসম্ভ্রম আছে, ধনসম্পত্তি আছে, কুলমর্য্যাদা আছে, নামগৌরব আছে, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সহস্র অবলম্বন আছে, সহস্র সুখের কারণ আছে, একটী না হইলে অন্যটী অন্বেষণ করিতে পারে, সেটী না পাইলে অপর একটী অনুসন্ধান করে, সেই অনুসন্ধানে জীবন স্বপ্নবৎ অতিবাহিত হয়। চেষ্টা সফল হউক বা না হউক, যতদিন চেষ্টা থাকে, যতদিন আশা থাকে, ততদিন জীবন দুর্ব্বহণীয় হয় না। আর আশা নাই কোন্ মনুষ্যের? যুবকের উচ্চাভিলাষ, মান, সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা; বৃদ্ধের ধন-কামনা, পুত্র কামনা, বংশ বৃদ্ধি কামনা, সহস্র কামনা, সহস্র আকাঙ্ক্ষায় জীবন অতিবাহিত হয়। আর অভাগিনী নারীকুলের কি আছে?

কমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন, সরলার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সরলা একাগ্রচিত্তে শুনিতেছে, আর তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন আবার বলিতে লাগিলেন—

অভাগিনী নারীকুলের কি আছে ? সংসারস্বরূপ অপার সমুদ্রে তাহাদিগের একটী মাত্র ক্ষুদ্র তরী আছে; সেটী ভালবাসা। সেই ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপার সংসারে আইসে, যদি সেই তরীটী ডুবিল, তবে নারীর আর অবলম্বন নাই, আর সুখের কারণ নাই, আর আশা নাই, আর ভরসা নাই, অতল জলে মৃত্যু ভিন্ন আর উপায় নাই।

সরলা বলিল—আমার বোধ হয়, দিদি, তুমি বড় দুঃখিনী, তোমার দুঃখকথা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়।

কমলা উত্তর করিলেন—

তথাপি, সরলা, আমি দুঃখিনী নহি। চিন্তাই আমার জীবনস্বরূপ হইয়াছে। ঐ যে গলিত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে পাইতেছ, মধ্যাহ্নে যখন ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া ঐ মর্ম্মর-শব্দ শ্রবণ করি, তখন আমার হৃদয় শান্তিরসে পরিপূরিত হইতে থাকে। ঐ যে আকাশে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের ভিতর দিয়া চন্দ্র যাইতেছে দেখিতেছ, ক্ষণেকমাত্র ঈষৎ অন্ধকার করিয়া আবার পরিষ্কার নীল গগনমণ্ডলে বাহির হইয়া আপন জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে, ঐ চন্দ্র ও আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি নিরুপম শান্তি লাভ করি। এই সকল দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে অনন্ত ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাতেই আমার সুখ ; সরলা, আমি দুঃখিনী নহি।

সরলা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল—দিদি, তোমার পূর্ব্বকথা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা করে।

কমলা বলিলেন—সরলা, তুমিও আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে ? আশ্রমবাসীদিগের নিকট আমি কিছুই বলি না, কিন্তু

ভগিনি! তোমার নিকট আমার লুকাইবার কিছুই নাই; আমি সত্য সত্য বলিতেছি, আমার জীবন কোন অপরূপ মোহজালে জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমি ভেদ করিতে পারি না—আমার পূর্ব্বকথা কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

সরলা আশ্চর্য্য হইল, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—কিছুই মনে নাই? দিদি, তোমাদের বাড়ী কোথায়?

কমলা। পশ্চিমদেশে; গ্রামের নাম স্মরণ নাই।

সরলা। তোমার পিতার নাম কি?

কমলা। আমি শৈশব হইতে অনাথা।

সরলা। তোমার স্বামীর কি নাম ছিল?

কমলা। নাম স্মরণ নাই। কেবল সে দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে।

সরলা। দিদি, তুমি অকালে বিধবা হইলে কিরূপে?

কমলা। একটা কি মহা বিপদে তাঁহাকে হারাই। তাহার পর আমার ভয়ঙ্কর পীড়া হয়, তদবধি এই পবিত্র মহেশ্বর মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছি।

কমলা ক্ষণেক পর বলিতে লাগিলেন—আমার কেবল এই-মাত্র স্মরণ আছে যে, কিছুদিন পীড়ায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম, হৃদয়ে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়াছিলাম, যাতনায় অস্থির হইয়াছিলাম। সেই পীড়ার সময় স্বপ্নে স্বামীর দেবমূর্ত্তি দেখিতাম। বোধ হইত যেন অপরিসীম নীল আকাশের মধ্যে চন্দ্রকরোজ্জ্বল একটী ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডে সেই দেবমূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছেন। এখনও আকাশের দিকে চাহিলে তাঁহাকেই দেখিতে পাই!

কমলা আরও বলিতে লাগিলেন—যখন আমি ঘোর পীড়া সহ্য করিতেছিলাম, তখন সকল লোকেই স্থির করিল যে, আমি আর বাঁচিব না। পিতা চন্দ্রশেখর সেই সময়ে তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন। পিতার দয়ার শরীর, তিনিই আমাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় বিধবাকে পিতা আশ্রয় দান করিয়া আপন নৌকায় তুলিলেন। তখনও আমার ঘোরপীড়া, গ্রামের সকলেই স্থির করিল যে নৌকাতেই আমার মৃত্যু হইবে। অনেক দিন জলপথে আসিতে লাগিলাম, নদীর স্বাস্থ্যজনক বায়ুতে আর পিতার যত্নে আমি পুনরায় আরোগ্যলাভ করিলাম। কিছুদিন পরেই নৌকা আসিয়া এই মন্দিরের ঘাটে লাগিল, সেই অবধি আমি পিতার গৃহেই রহিয়াছি।

শুনিতে শুনিতে সরলার চক্ষুতে জল আসিল। সরলা ধীরে ধীরে কমলার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণ-পূর্ব্বক বলিল—দিদি, আমি আর নিজের জন্য দুঃখ করিব না, তোমার দুঃখকথা শুনিয়া আমি নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি।

দুই জনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে একজন লোক আসিয়া সরলার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিল—কে বল দেখি ?

সরলা সে স্বর চিনিত, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল না, একে একে বনগ্রামবাসিনীদিগের নাম করিতে লাগিল।

"নিস্তারিণী"—চক্ষু হইতে হস্ত উঠিল না।

"মনোমোহিনী"—তথাপি হস্ত উঠিল না।

"যোগেন্দ্রমোহিনী"—তবু হইল না।

"তারা"—

তোর মাথা, আমাকে ইহার মধ্যেই ভুলেছিস্, তবু এখনও বিবাহ হয় নাই, না জানি বিবাহের জল গায়ে লাগিলে কি হইবে!—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলার প্রিয় সই অমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরলার বিস্ময়ের সীমা থাকিল না—সই?—এখানে!—কবে আসিলে? বাষ্পপরিপূর্ণলোচনে সরলা অমলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষে আপন মুখ লুকাইল। অমলাও যখন অনেকদিন পরে সেই প্রেমপুত্তলীটীকে হৃদয়ে স্থান দিল, তখন তাহার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না।

ক্ষণেক পর অমলা বলিল—এই দুই প্রহর রাত্রিতে এই অন্ধকারে এখানে বসিয়া আছ? আমি যে তোমার জন্য কত অন্বেষণ করিয়াছি বলিতে পারি না।

সরলা। এখানে কমলাদিদির সহিত আসিয়াছি, কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইয়াছে। সই, তুমি অদ্য আসিলে?

অমলা। হাঁ আমি আজই আসিয়াছি, তোমাকে দেখিবার জন্য কতদিন আসিব আসিব মনে করি, তা "বৃদ্ধস্বামী" কি আমাকে ছাড়ে? আজ কত করিয়া তবে আসিলাম।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনজন আশ্রমে ফিরিয়া আসিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ইচ্ছাপুরের জমীদার।

BUT I have woes of other kind,
　Troubles and sorrows more severe,
Give me to ease my tortured mind,
　Lend to my woes a patient ear.

Crabbe.

চন্দ্রশেখর ও শিখণ্ডিবাহন ভিন্ন সে গ্রামে আর কেহই মহাশ্বেতার প্রকৃত পরিচয় জানিতেন না। তাঁহারাও এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

মন্দিরের শান্ত, দ্বেষবিদ্বেষশূন্য নিবাসীগণের সহিত একত্র বাস করিতে করিতে মহাশ্বেতার অন্তঃকরণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে বয়সে স্বভাবের পরিবর্ত্তন কখনই হয় না। মহাশ্বেতার বিজাতীয় মান ও জিঘাংসা অন্তরে সেইরূপই জাগরিত ছিল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি সেইরূপই প্রতিরাত্রি বৈরনির্য্যাতনের জন্য শিব পূজা করিতেন।

চন্দ্রশেখরের কুটীরে অদ্য এক জন অতি সমৃদ্ধিশালী অতিথি আসিয়াছেন বলিয়া অনেকেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হইলে তথায় যাইয়া সমবেত হইলেন। গৃহের মধ্যস্থানে চন্দ্রশেখর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক হইয়াছে। কিন্তু দিন দিন মন্দিরের শান্ত দেবকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াই হউক, বা মানসিক শান্তি বশতঃই হউক, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে একটীমাত্র বার্দ্ধক্য চিহ্ন নাই। নয়ন দুটী জ্যোতিঃপূর্ণ, সমস্ত শরীর তেজঃপূর্ণ, সেই শরীরের উপর যজ্ঞোপবীত লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সেই সমৃদ্ধিশালী অতিথি বসিয়া আছেন, তাঁহারও বয়ঃক্রম চন্দ্রশেখরের সহিত সমান হইবে, কিন্তু সংসার চিন্তায় ও পার্থিব দুঃখে তাঁহার শরীর শীর্ণ করিয়াছে। মস্তকের কেশ অধিকাংশ শুক্ল হইয়াছে, ভ্রূযুগলের কেশও দুই একটী শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। চক্ষুতে জ্যোতিঃ নাই, বদনমণ্ডলে কান্তি নাই, বিশাল শরীরে এক্ষণে আর বল নাই। তাঁহাদিগের দুইজনকে দেখিলে সংসার ও সংসারচিন্তার অকিঞ্চিৎকারিতা, ও পুণ্যবলের মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সমৃদ্ধিশালী অতিথি পাঠক মহাশয়ের নিতান্ত অপরিচিত নহেন; ইনি ইচ্ছাপুরের জমীদার নগেন্দ্রনাথ।

সেই দুইজনের উভয়পার্শ্বে ও পশ্চাতে অনেক মন্দিরবাসী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে, ঈষৎ অন্ধকারে, মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহন বসিয়া রহিয়াছেন, মৃদু মৃদু কি কথা কহিতেছেন, এক এক বার নগেন্দ্র-

নাথের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন। চন্দ্রশেখরের বামহস্তের নিকট, কমলা বিনীতভাবে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। কুটীরের একপার্শ্বে অমলা ও সরলা বসিয়া রহিয়াছে, আজ তাহাদিগের আনন্দ অপার, তাহাদিগের গল্প শেষ হইতেছে না, তাহাদিগের সুমিষ্ট ওষ্ঠে সুহাসি শুকাইবার সময় পাইতেছে না। অপর একটী পার্শ্বে নিস্তারিণী, মনোমোহিনী, যোগেন্দ্রমোহিনী ও তারাসুন্দরী প্রভৃতি অল্প-বয়স্কা ব্রাহ্মণকন্যাগণ আমোদ ও রহস্য করিতেছে, আবার এক একবার নিস্তব্ধ হইয়া চন্দ্রশেখর ও নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—মহাত্মন্! আমি আপনার বিস্তীর্ণ মহেশ্বর-মন্দির দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। যদি মোহময় সংসার ত্যাগ করিয়া আপনার মত এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতাম, তাহা হইলে এই বার্দ্ধক্যে আমি অসীম দুঃখসাগরে ভাসিতাম না। চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন—মহাশয়, কেবলই কি মন্দিরে পুণ্যকর্ম্ম করা যায়, সংসারের মধ্যে থাকিয়া কি পুণ্যকর্ম্ম সম্ভবে না? শাস্ত্রে বলে সত্য ও পরোপকারিতায় যত পুণ্য, যাগযজ্ঞে তত নাই। যে জমীদার পরোপকারিতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য সর্ব্বত্রই সমাদৃত, তাঁহার কি মন্দির-বাসের জন্য আক্ষেপ উচিত?

নগে। মহাশয়! আপনি আমাকে অতিশয় সম্মান করিলেন, আমি সে সম্মানের যোগ্য নহি। যদি যোগ্য হইতাম, তবে আজ পাপ প্রশমনার্থ মহাত্মা চন্দ্রশেখরের নিকট আসিতাম না।

চন্দ্র। এ জগতে সহস্রগুণসত্ত্বেও কে মহাপাপী নহে? কে বলিতে পারে আমি পাপ করি নাই—কে বলিতে পারে আমি নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধী?

দুইজনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নগেন্দ্রনাথ আপনার আসিবার কারণ বলিতে লাগিলেন।
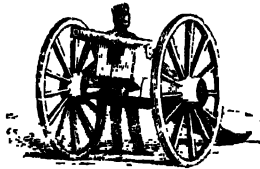
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জমীদারের পূর্ব্বকথা।

AND let me if I may not find
A friend to help, find one to hear.

Crabbe.

নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন—মহাত্মন্, আমার মত দুঃখী আর কেহই নাই, আমার দুঃখকথা শ্রবণ করুন।

আমার সহধর্ম্মিণী আমাকে বলিতেন যে, যেদিন তাঁহার জন্ম হয়, সেদিন আকাশে অপরূপ তিথি-নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত গণিয়া বলিয়াছেন যে, শিশুকন্যা ঘোর উন্মাদিনী হইবেন। সে ভ্রম, আমার সহধর্ম্মিণী উন্মাদিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি মনোবৃত্তি অতিশয় বেগবতী ছিল, সে জন্য আমি তাঁহাকে পাগলিনী বলিতাম। আজি দ্বাদশ বর্ষ হইল, সে স্নেহময়ী পাগলিনীর কাল হইয়াছে।

পাগলিনীর গর্ব্ভে আমার দুইটী পুত্র জন্মে। দুই জনই তাহাদিগের গর্ব্ভধারিণীর মত পাগল। জ্যেষ্ঠটী চিন্তায় পাগল,

কনিষ্ঠটী কার্য্যকর্ম্মে পাগল। সে দুইটী পুত্র আমার দুইটী নয়-নের তারা ছিল—আজ তাহারা কোথায়? হায় দারুণ বিধি! বার্দ্ধক্যে কি আমার কপালে এই লিখিয়াছিলে? আমার দুইটী নয়নই গিয়াছে, আমি অন্ধ হইয়াছি। দুইটী রত্ন হারাইয়া আমি কাঙ্গালী হইয়াছি।

সে দুঃখবচনে সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ক্ষণেক পরে নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন—

আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে অল্প বয়সে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। তাহা-রই শোকে তাহার মাতা কালগ্রাসে পতিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মুখ চাহিয়া আমি সে শোক সহ্য করিয়াছিলাম। আহা! সেরূপ বীরপুত্র কেহ কখনও দেখে নাই। দয়া ধর্ম্মে, বিদ্যালোচনায়, বল ও বিক্রমে সুরেন্দ্রনাথের মত কে ছিল? বৎস নবীনবয়সে সিংহবল ধারণ করিত, মল্লযুদ্ধে পালওয়ান-দিগকে পরাস্ত করিত, বাহুবলে সকলকে বিস্মিত করিত, অশ্বচালনায় তাহার সমকক্ষ এদেশে কাহাকেও দেখি নাই। যে দেখিত, সুরেন্দ্রনাথকে দয়ায় দাতাকর্ণ বলিত, বল-বিক্রমে ভীমাবতার বলিত। বালক বাল্যকালেই রাজা সমরসিংহের নিকট যুদ্ধবার্ত্তা শুনিতে ভাল বাসিত, শুনিতে শুনিতে বালকের মুখ গম্ভীর হইত, নয়নদ্বয় প্রজ্জ্বলিত হইত। শিশু সমরসিংহের খড়্গ ধারণ করিত ও যুদ্ধে যাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিত, রাজা সমরসিংহ অশ্রুপূর্ণলোচনে বালককে চুম্বন করিতেন। বাল্যকালেই তাহাকে রাজা সমরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন। রাজা সর্ব্বদাই বলিতেন—পাঠা-নেরা বাঙ্গালীদিগকে ভীরু বলিয়া ভর্ৎসনা করে, কিন্তু সেই

বাঙ্গালীর মধ্যেও, মধ্যে মধ্যে বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ! আমি মরিলে তুমি আমার তরবারি লইবে, তোমার হস্তে এ খড়্গের অপমান হইবে না। আজি সে সুরেন্দ্র কোথায়! বিধাতঃ! এক্ষণে আর কে আছে যাহার মুখ চাহিয়া আমি সুরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ সহ্য করিব।

বৃদ্ধ দুই একটী অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন। চন্দ্রশেখর শোকার্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

সুরেন্দ্রনাথের কোন অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়াছেন?

নগেন্দ্রনাথ। তাহা যদি শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে আর এতক্ষণ জীবিত থাকিতাম না।

চন্দ্র। তবে এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? সুরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিদেশে গিয়াছেন, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অবশ্যই কুশলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

নগে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহাই হয়। কিন্তু আমি কল্য রাত্রিযোগে অতিশয় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই জন্যই ব্যাকুল হইয়াছি, সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। বোধ হইল যেন ভয়ঙ্কর তরঙ্গ রাশির মধ্যে আমার পুত্রকে দেখিলাম, যেন সে তরঙ্গ রাশিতে আমার দেবতুল্য পুত্র নিমগ্ন হইতেছে, দূর দেশে বন্ধুহীন সহায়হীন হইয়া নিমগ্ন হইতেছে। প্রভু! এ স্বপ্নের অর্থ করিয়া দিন, যদি কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে তবে আমি এই ক্ষণেই প্রাণত্যাগ করিব।

চন্দ্রশেখর বলিলেন—শান্ত হউন। ভগবান্ আপনার বীর পুত্রকে রক্ষা করিবেন; পুণ্যাত্মা প্রজাবৎসল জমীদারকে বৃদ্ধ-বয়সে পুত্রহীন করিবেন না।

নগেন্দ্রনাথ সজলনয়নে উত্তর করিলেন—প্রভু! আমাকে পুণ্যাত্মা বলিবেন না, আমি বহু পাপে কলঙ্কিত। যদি রুচি হয়, যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ হয়, আমার পাপ কথা শ্রবণ করুন, তৎপরে উপায় বিধান করুন।

যখন আমার সুরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, তখন আমি সপুত্রে রাজা সমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম! আপনি জানেন রাজা সমরসিংহ বঙ্গদেশীয় কায়স্থজমীদারদিগের শিরোরত্ন ছিলেন, এবং আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন। একদিন আমরা দুইজনে কথা কহিতেছি, আমাদের পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ আর সমরসিংহের একমাত্র দুহিতা ক্রীড়া করিতেছিল। ক্রীড়াচ্ছলে সেই দুহিতা একটী পুষ্পমাল্য লইয়া সুরেন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া দিল। রাজা কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, কন্যার এই কার্য্যটী দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। আমাকে বলিলেন—নগেন্দ্রনাথ, অনেক রাজপুত্রের সহিত আমার এই কন্যার সম্বন্ধ হইতেছে; কিন্তু কন্যা যাহাকে আপনি বরণ করিয়াছে তাহারই সহিত আমি উহার বিবাহ দিব। আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না, বঙ্গচূড়ামণি রাজা সমরসিংহ একমাত্র দুহিতাকে যে এই অকিঞ্চিৎকর জমীদারের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাহা আমার সৌভাগ্য। সেইদিনই আমরা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলাম,—সে অঙ্গীকার আমি ভঙ্গ করিয়াছি!

মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইতেছিল। তিনি নগেন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনিবার জন্য তথায় বসিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন—আমি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি। সমরসিংহের মৃত্যুর পর আমি নিরাশ্রয় বিধবার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হইলাম। তখন আমি অন্য সম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিলাম। বঙ্গদেশে সমৃদ্ধশালী কায়স্থ জমীদারের অভাব নাই, ইচ্ছাপুরের জমীদারকুলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে কেহই বিমুখ নহেন। শীঘ্রই উপযুক্ত পাত্রী পাইলাম। কিন্তু যদিও আমি অঙ্গীকারভঙ্গে তৎপর হইয়াছিলাম, আমার ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র তাহাতে অসম্মত হইল। একদিন আমাকে বলিল—পিতা, আমি আপনার কোন কথায় অবাধ্য হইতে পারি না, কিন্তু একটী বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি রাজা সমরসিংহের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিতে দিব না। পুত্রের এই যথার্থ কথায় আমি রুষ্ট হইলাম, তৎক্ষণাৎ নূতন পাত্রীর সহিত বিবাহের দিন স্থির করিলাম, বলপূর্ব্বক তাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু আমায় পুত্রের কথাই রহিল, আমার পুত্র গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তাহাকে সেই অবধি আর দেখি নাই!

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন—সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি, সেই জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে আমার এই যাতনা। কোথায় এই বয়সে আমার অশ্বিনীকুমারের ন্যায় দুই পুত্র আমার হস্ত হইতে জমীদারীর ভার লইবে, কোথায় চন্দ্রাননা পুত্রবধূদ্বয় বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহা না হইয়া আমার পুত্র নাই, পুত্রবধূ নাই, স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী নাই,

আমি অগাধ সমুদ্রে ভাসিতেছি। প্রভু! আমার ন্যায় হতভাগ্য এ তিন সংসারে আর কে আছে?

এই কথা সাঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, সে রোদন শুনিয়া সকলের হৃদয় বিগলিত হইল। চন্দ্রশেখর অনেকক্ষণ সান্ত্বনা করায় অবশেষে বৃদ্ধ শান্তি লাভ করিলেন।

তৎপরে শিখণ্ডিবাহন নগেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া যদি অন্যায় করিয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা পুনরায় পালন করিতে যত্নবান্ হউন।

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন—শিখণ্ডিবাহন্! আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিব। রাজা সমরসিংহের অনাথা দুহিতাকে আনিয়া দাও, আমার সুরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ দিব। আর আমার পূর্ব্ববৎ গর্ব্ব নাই, পূর্ব্ববৎ অভিমান নাই, এবার যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তাহা হইলে যেন আমি আর পুত্রের মুখ কখন না দেখিতে পাই। ইহা অপেক্ষা অভিশাপ আমি আর জানি না।

শিখণ্ডিবাহন কোন উত্তর না করিয়া মহাশ্বেতার সহিত পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন। সে কি কথা হইতেছিল পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবেন।

শিখণ্ডিবাহন বলিতেছিলেন—ভগিনি! আর বিলম্বে আবশ্যক কি? আপনার পরিচয় দিন্।

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন—যদি বিধাতা আমাদিগকে পূর্ব্বমত উন্নতিসম্পন্ন না করেন, তাহা হইলে এজন্মে পরিচয় দিব না, এ জন্মে কন্যার বিবাহ দিব না।

শিখণ্ডি। কেন?

মহাশ্বেতা। পরের নিকট অনুগ্রহ গ্রহণ করা আমার স্বামীর রীতি ছিল না। তিনি অপরকে অনুগ্রহ বিতরণ করিতেন, কাহারও নিকট অনুগ্রহ গ্রহণ করিতেন না।

শিখণ্ডি। তবে আপনি আমাকে নগেন্দ্রনাথের নিকট প্রতিজ্ঞাপালনের প্রস্তাব করিতে বলিলেন কেন?

মহাশ্বেতা। এ অবস্থায় উনি প্রতিজ্ঞাপালনে সম্মত আছেন কি না দেখিবার জন্য, আমি সম্মত নহি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বনগ্রাম ত্যাগ।

> ALL prevailing foe!
> I curse thee! let a suffering curse
> Clasp thee, his torturer, like remoarse.
>
> *Shelley.*

কুটীরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, একে একে তাঁহারা প্রায় সকলেই উঠিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণকন্যাগণ সকলেই আপন আপন গৃহে গমন করিলেন। মহাশ্বেতা এখনও বসিয়াছিলেন, আর অমলা প্রিয়সখীর মস্তক আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। অমলা এতক্ষণ কিজন্য বসিয়াছিল, পাঠক মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করেন? অমলা ভাবিতেছে—জমীদার মহাশয়ের পুত্র বিবাহ করিতে অসম্মত হইয়া পিতার গৃহত্যাগ করিয়াছেন, জমীদার মহাশয় এইরূপ বলিতেছেন; হরি! হরি! যদি ইন্দ্রনাথ এই জমীদার মহাশয়ের পুত্র না হয়, তবে আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে নহি! মন, স্থির হও, পিতা যাহাকে

বিবাহ করিতে বলে তাহাকে বিবাহ করিবে না, সমরসিংহের মেয়েকে বিবাহ করিবে, সমরসিংহের বিধবা এক্ষণে নিরাশ্রয়, ছদ্মবেশে আছেন, তাঁহার মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছে; হরি, হরি! আমার সই কি সমরসিংহের কন্যা? মহাশ্বেতাকে দেখিলেও রাজরাণীর মত বোধ হয়, সামান্য কায়স্থ বিধবার মত বোধ হয় না, কাহারও সহিত অধিক কথা কহেন না, প্রত্যহ শিব পূজা করেন, বৃদ্ধ বয়সেও মুখে স্বর্গীয় মহিমা বিরাজ করিতেছে। আর সরলা! সই আমার বক্ষের উপর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, আমার বোধ হয় উহার মন ইহা অপেক্ষাও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত, আপনি রাজকন্যা হইয়াও তাহা জানে না। রাজকুমারীর সহিত কি আমি বন্ধুত্ব করিতে সাহস করিয়াছি? রাজকুমারীর পদবিক্ষেপে কি রুদ্রপুর ও বনাশ্রমের পথ ও ঘাট পবিত্র হইয়াছে? ভগবান্! তুমিই জান, আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছিনা। অমলা এইরূপ চিন্তায় অভিভূত হইয়া নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিল।

জমীদার নগেন্দ্রনাথ শয়ন করিতে গেলেন। স্নেহময়ী কমলা বৃদ্ধ শোকার্ত্ত জমীদারের অনেক সেবা শুশ্রূষা করিলেন। কমলা ও সরলা, দুইজনে আজি নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া স্বজাতীয় জমীদারকে খাওয়াইয়াছেন, সযত্নে জমীদারের শয্যা রচনা করিয়াছেন, জমীদারের অনেক সেবা করিয়াছেন। জমীদার এই শান্ত নম্রমুখী রমণীদ্বয়ের যত্ন দেখিয়া প্রীত হইলেন, সজল নয়নে কহিলেন—মা কমলা, তুমি আর ঐ বালিকা সরলা বৃদ্ধের জন্য অদ্য যে সেবা ও যত্ন করিলে, এ বৃদ্ধ এতটুকু যত্ন অনেক দিন পায় নাই। আমি যদি অভাগা না হইতাম, তোমাদের মত

স্নেহময়ী পুত্রবধূদ্বয় আজি আমার সেবা করিত, তোমাদের ন্যায় শান্ত, সুরূপা পুত্রবধূদ্বয় আমার ঘর আলো করিত! কিন্তু বিধাতা সে সুখ আমার কপালে কি লিখিয়াছেন? কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় পুত্রদ্বয়, লক্ষ্মীর ন্যায় স্নেহময়ী পুত্রবধূদ্বয় আমার গৃহ কি পূর্ণ করিবে? আমি সংসার অনেক দেখিয়াছি, এই গ্রামের ন্যায় শান্তিপূর্ণ স্থান সংসারে বিরল। আমি অনেক কায়স্থকুল দেখিয়াছি, তোমাদের ন্যায় স্নেহময়ী সর্ব্বগুণসম্পন্না কায়স্থকন্যা অতি বিরল।

অমলাও শয়নার্থ গমন করিল। বাহিরের কুটীরে কেবল মহাশ্বেতা সরলাকে লইয়া এখনও বসিয়া আছেন, শীঘ্র শয়ন-কক্ষে যাইবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকাবেশে একজন নারী আসিয়া মহাশ্বেতার কাণে কাণে বলিল—রাণীমা, একবার এদিকে আসুন।

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন! এ গ্রামে তাঁহাকে "রাণীমা" বলিয়া কে চিনিল! পরিচারিকা আবার বলিল,—রাণীমা, আমাকে চিনিতে পারিলেন না? আমি যে আপনারই পুরাতন দাসী।

মহাশ্বেতা তখন তাহাকে চিনিলেন, সে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের একজন পুরাতন পরিচারিকা ছিল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

এ কি! তুই এত দিন পর কোথা হইতে আসিলি, কি জন্যই বা আসিলি? আমরা এ গ্রামে আছি কিরূপে জানিলি?

পরিচারিকা। আপনারা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে চলিয়া যাইবার পর আপনার শ্বশুরকুলের লোক আপনার জন্য কত অনুসন্ধান করিয়াছে, কচিমেয়ে সরলার জন্য কত কাঁদা কাটি করিয়াছে, তাহা আর কি বলিব মা? সে সব কথা পরে

বলিব। অনেক অনুসন্ধান করিয়া শেষে আপনাদের পাইলাম। সরলাদিদির পিশিমা একবার ভাইঝীর মুখ খানি দেখিবার জন্য কত দেশে ঘুরিয়াছেন তাহা আর কি বলিব। শেষে রুদ্রপুরে যান, তথা হইতে নৌকা করিয়া এই গ্রামে আসিয়াছেন। এখানে তাঁহার আসিতে ভয় হয়; যদি রাণীমা কন্যাকে লইয়া একবার নৌকায় যাইয়া দেখা করেন তাহা হইলে পিশিমা আপনাদিগকে অনেক দিন পরে দেখিয়া একবার চক্ষু জুড়ান।

পুরাতন কথা মনে উদয় হওয়ায় মহাশ্বেতার পাষাণ হৃদয় গলিত হইল, নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। সে অশ্রু সম্বরণ করিয়া সরলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি পরিচারিকার সঙ্গে ঘাটের দিকে চলিলেন।

ঘাট অতি নিকটে। ঘাটে আসিয়া পরিচারিকা নৌকা দেখাইয়া দিল। নৌকাখানি অতি ক্ষিপ্রগামী, দশ বাঁর জন দাঁড়ী দাঁড় ধরিয়া রহিয়াছে। নৌকার ভিতর হইতে জনৈক বৃদ্ধা রমণী তাঁহাকে আসিতে ইঙ্গিত করায় মহাশ্বেতা তৎক্ষণাৎ সরলাকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তন্মুহূর্ত্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল, পরিচারিকা নৌকায় না উঠিয়া অন্য দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। নৌকার ভিতর বৃদ্ধ নারী সরলার পিশিমা নহেন, শকুনির একজন চর মাত্র! মহাশ্বেতা ও তাঁহার কন্যা অদ্য সতীশচন্দ্রের বন্দী হইলেন!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাবাস।

The pale stars of the morn
Shine on a misery, dire to the borne.
Dost thou faint?

Shelley.

প্রাতঃকালে স্বর্ণবর্ণ সূর্য্যরশ্মি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের (আধুনিক চৌবেড়ে) শোভা বর্দ্ধন করিতেছে! প্রাচীর, স্তম্ভ, গবাক্ষ, কক্ষ, ছাদ, সকলই আলোকময় করিতেছে, দুর্গপদচারিণী শান্তপ্রবাহিণী যমুনার উপর ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদী-বক্ষে প্রকাণ্ড দুর্গের ছায়া প্রতিফলিত রহিয়াছে, আর দুই একখানি ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে। শীতল সমীরণ ক্ষেত্রস্থিত শিশিরবিন্দুতে সিক্ত হইয়া অধিকতর শীতল হইয়া বহিতেছে, ও ঘাটে যে সকল রমণী স্নান করিতে বা জল লইতে আসিয়াছে, তাহাদিগের শরীর পুলকিত করিতেছে। কৃষকগণ গরু লইয়া মাঠে যাই-তেছে ও রহিয়া রহিয়া আনন্দে গান করিতেছে, এবং পক্ষিগণ

তরুণ অরুণ কিরণে পুলকিত হইয়া সেই গানে যোগ দিতেছে। সমস্ত জগৎ আলোকময় ও আনন্দময়।

সেই প্রকাণ্ড দুর্গের নিম্নতলে একটী নিভৃত ঘরে একটী হীনজ্যোতিঃ প্রদীপালোকে মহাশ্বেতা ও সরলা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা শকুনীর চর দ্বারা আনীত হইয়া এই দুর্গে বন্দী হইয়াছেন।

সরলা নিদ্রিত। মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় মহাশ্বেতার পার্শ্বে বালিকা নিদ্রিত রহিয়াছে, সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সরলা নিদ্রা যাইতেছে। সরলার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, চক্ষু দুইটী কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, মুখমণ্ডলে পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা বা বালিকাভাব দেখা যায় না, সরলা আর বালিকা নাই। সহসা অসীম শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া বালিকা-সুলভ সুখসপ্ন হইতে জাগরিত হইয়াছে।

সরলার পার্শ্বে মহাশ্বেতা অনিদ্র হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে যে ভাব লক্ষিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত, সে ভাব ভয়ের নহে, দুঃখের নহে, কেবল চিন্তার নহে। নয়ন জ্বলিতেছিল, সূক্ষ্ম ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে, সমস্ত মুখমণ্ডলে উন্মত্তভাব যেন লক্ষিত হইতেছে। ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয় পূর্ব্বস্মৃতি ও চিন্তাতরঙ্গে প্লাবিত হইতেছে।

ক্ষণেক পর সরলা জাগিল। উঠিয়া মাতার মুখমণ্ডলে চাহিয়া বলিল—মা, সমস্ত রাত্রি তোমার নিদ্রা হয় নাই?

মহাশ্বেতা কোনও উত্তর করিলেন না। সরলা আবার বলিল—

মা, তোমার জন্য কল্য যে অন্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহা একক্ষণও স্পর্শ কর নাই, যেরূপ ছিল সেইরূপ আছে।

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন—না মা, আহারে রুচি নাই।

সরলা। না খাইলে শরীর কতদিন থাকিবে?

মহেশ্বেতা। বাছা, আর শরীর থাকার আবশ্যক কি? ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া যদি ইহার অগ্রেই আমার মৃত্যু ঘটাইতেন, তাহা হইলে তোমাকে এ অবস্থায় দেখিতে হইত না।

সরলা। মা, তুমি না থাকিলে আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব, জগতে আর আমার কে আছে যে তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?

মহাশ্বেতা সজলনয়নে উত্তর করিলেন—না মা, হতভাগিনীর এখনও যাইবার সময় হয় নাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে ঘরের দ্বার খুলিল। মহাশ্বেতা দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন নিরুপমা সুন্দরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। বলিবার আবশ্যক নাই যে, সে সুন্দরী বিমলা।

বিমলা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে দুঃখে অধীর হইল। দেখিলেন পূর্ব্বদিনের খাদ্যদ্রব্য এখনও স্পর্শ করা হয় নাই, বৃদ্ধা মহাশ্বেতা প্রায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বালিকা নীরবে রোদন করিতেছে।

বিমলা আপন চক্ষু মুছিয়া, মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—মাতঃ, আপনাদিগের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আপনারা বাহিরে আসুন।

রমণীকণ্ঠনিঃসৃত করুণাসূচক কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা সেই দিকে চাহিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? বিমলা উত্তর করিলেন—এই দুর্গাধিপতি সতীশচন্দ্রের দুহিতা, আমার নাম বিমলা।

ক্রোধে মহাশ্বেতা শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পর ধীরে ধীরে বলিলেন—তোমার পিতাকে বলিও, আমাদের আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই, যে কয়েক দিন আছি, আমাদিগকে নির্জ্জনে থাকিতে দাও, তোমরা আসিয়া বিরক্ত করিও না;

অন্য সময়ে এরূপ উত্তর পাইলে মানিনী বিমলা ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু বন্দীদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের লেশ মাত্র উদয় হইল না। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—আমার পিতার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন, তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আসি নাই, এই জঘন্য ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।

মহাশ্বেতা পুনরায় বলিলেন—বন্দীর এইরূপ ঘরেই থাকা ভাল, যাহার চরণে শিকল, তাহার সে শিকল স্বর্ণের না হইয়া লৌহের হওয়াই উপযুক্ত! যাও বাছা, হতভাগিনাদিগের কষ্টের উপর আর উপহাস করিও না।

বিমলা সজলনয়নে উত্তর করিলেন—মাতঃ, আমি যে আপনাদিগকে উপহাস করিতে আসি নাই, জগদীশ্বর জানেন।

বিমলা আরও বলিতেন, কিন্তু মহাশ্বেতা তীব্রস্বরে বলিলেন—জগদীশ্বরের নাম করিও না, তোমার পিতা যেন

সে পবিত্র নাম কখনও গ্রহণ না করেন, এবংশে যেন সে নাম কেহ গ্রহণ করিয়া অপবিত্র না করে।

বিমলা গম্ভীরস্বরে বলিলেন—মাতঃ, আপনি আমাদিগকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন! আপনি যেরূপ হতভাগিনী, আমিও সেইরূপ; হতভাগিনীর জগদীশ্বরের নাম ভিন্ন আর কি আছে? মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই নাম স্মরণ করিব, এই দুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে হতভাগিনীর সেই নামই অবলম্বন, সেই নামই একমাত্র সুখ।

সে পবিত্র কথা শুনিয়া মহাশ্বেতার ক্রোধ লীন হইল। বিমলার ঈশ্বর-ভক্তি দেখিয়া মহাশ্বেতা একদৃষ্টে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, দেবকন্যার মত সেই উন্নত-প্রকৃতি রমণীরত্ন দণ্ডায়মান আছেন। নয়নে অশ্রুজল; মুখে স্বর্গীয় প্রেম ও ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না।

মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—বিমলা, ক্ষমা কর; না জানিয়া তিরস্কার করিয়াছি, দুঃখে বিবেচনা-শক্তির লোপ হয়।

বিমলা মহাশ্বেতাকে আর কথা বলিতে দিলেন না। নিকটে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—মাতঃ, ক্ষমা প্রার্থনার কিছুই কারণ নাই; আপনিও দুঃখিনী, আমিও অল্প দুঃখিনী নহি, আমার অবস্থা জানিলে আপনিও আমার প্রতি দয়া করিবেন।

মহাশ্বেতা বিমলার হাত ধরিয়া রহিলেন, দুই জনে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন; হতভাগিনী সরলাও রোদন করিতে

লাগিল। ক্ষণেক পর মহাশ্বেতা বলিলেন—বিমলা, তোমার দুঃখ আমি বুঝিতে পারিতেছি। পিতার পাপকর্ম্ম দেখিয়া কোন্ ধর্ম্মপরায়ণা কন্যার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়?

বিমলা উত্তর করিলেন—মাতঃ, আপনি এখনও ভ্রান্ত। আমরা যেরূপ হতভাগা, আমার পিতাও সেইরূপ হতভাগা, তাঁহার জীবন মরণ এখনও স্থির নাই। যে পামর আপনাকে ও আমাকে কষ্ট দিতেছে, সে পিতাকেও হতভাগ্য করিয়াছে, আমি আশঙ্কা করি, সে পিতার মৃত্যুসঙ্কল্প করিতেছে।

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন—সে কি, সতীশচন্দ্র ভিন্ন ইহার ভিতর আর কে আছে?

বিমলা বলিলেন—উপরে আসুন, আমি সকল কথা আপনাকে অবগত করাইব।

তিন জনে ধীরে ধীরে সেই জঘন্য ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। বিমলা সরলাকে ভগিনীর মত স্নেহ করিয়া লইয়া যাইলেন। তাঁহাদিগের আহারাদি সাঙ্গ হইলে বিমলা শকুনিসংক্রান্ত সমস্ত কথা মহাশ্বেতাকে অবগত করাইলেন।
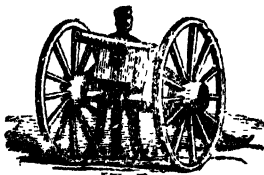
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

এ স্বপ্ন নহে—পূর্ব্বস্মৃতি।

WALL of my Sires, if ye could speak,
If ye could have a tongue,
Save by the owlet's awful shriek
Or ravens' uncouth song,
Fain would I ask of days gone by,
And o'er each tale would heave a sigh.

J. C. Dutt.

পৃথিবীতে একপ্রকার লোক আছে যে, তাহাদিগের মুখ দর্শন-মাত্রেই নির্দ্দয়ের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়, নিপ্প্রেমের হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হয়, সকলেরই হৃদয়ে স্নেহের উদ্রেক হয়। মুখের সে ভাব কেবল সৌন্দর্য্য নহে, কেন না সৌন্দর্য্য সকল হৃদয়কে সমরূপে আকৃষ্ট করিতে পারে না; কতক সৌন্দর্য্য, কতক অমায়িকতা, কতক বালিকার লজ্জা, কতক বালিকার নির্দ্দোষিতা। এক একখানি মুখের সরলতা ও নম্রতা দেখিলে ইচ্ছা হয় যে, তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিই,

তাহার সন্তোষার্থে জগৎসংসার ত্যাগ করি, তাহার সুখ-সাধনের জন্য চিরকাল ব্রতী হই। সরলা পরমা সুন্দরী নহে, অথচ তাহার মুখে এইরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব ছিল, হৃদয়ও মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে বিমলা যে তাহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিবেন, আশ্চর্য্য নহে।

আর একপ্রকার আকৃতি আছে, যাহাকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিবার জন্য প্রকৃতি আপন ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন। সে জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল, জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নযুগল, সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়, উন্নত ললাট, তুলিকাচিত্রতবৎ সূক্ষ্ম-ভ্রূযুগল, তনু অঙ্গ, সুগঠিত সুদীর্ঘ অবয়ব দেখিলে হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হইবার অগ্রে ভক্তির উদয় হয়। সে উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে, সে উন্নত, প্রশস্ত ললাটে হৃদয়ের উন্নতভাব প্রকাশ পায়, হৃদয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিরাজ করে। বিমলার এইরূপ সৌন্দর্য্য ছিল, তাঁহারও হৃদয় মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। এইরূপ দেবীর অবয়ব দেখিয়া সরলা যে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভক্তি করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

সরলার হৃদয় হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য বিমলা তাহাকে দুর্গের চারিদিক দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমে দুর্গের পশ্চাতে উদ্যানে লইয়া গেলেন। তথায় আম্রবৃক্ষের নিবিড় ছায়া দিবা দুই প্রহরকেও সন্ধ্যার ন্যায় সুস্নিগ্ধ করিয়াছে। দুইজনে সেই ছায়ায় ক্ষণেক বসিলেন, দুই প্রহরের মৃদু বায়ুতে অল্প অল্প পত্রের মর্ম্মর শুনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘুঘুর অতি মৃদু অপরিস্ফুট শব্দ শুনা যাইতেছে। সে শব্দে হৃদয় মোহিত ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

উভয়ে উদ্যান হইতে সরোবরসমীপে গমন করিলেন। তাহার জল অতি বিস্তীর্ণ, চারিপার্শ্বে আপন স্থির বক্ষে আম্রছায়া ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দুইজনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সরোবরের ঘাটে বসিয়া রহিলেন, স্বভাবের নিস্তব্ধ শোভা দেখিয়া হৃদয় নিস্তব্ধ হইল। বিমলা মধ্যে মধ্যে কথা কহিতেছেন, সরলার মুখে কথা নাই, নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছে।

সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেক পূর্ব্বেই সেই ঘনচ্ছায়ান্বিত আম্রবেষ্টিত সরোবরে অন্ধকার হইতে লাগিল। বিমলার বোধ হইল, যেন তাঁহার প্রিয়সখীর অন্তঃকরণেও কোন দুঃখ-তিমির ঘনীভূত হইতেছে।

বিমলা অতি স্নেহসহকারে সরলাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া আপন হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন—সরলা, তোমার মনে কোন দুঃখ উদয় হইতেছে? আমার নিকট লুকাইতেছ কি জন্য?

সরলা উত্তর করিল—তোমার কাছে লুকাইব কি জন্য? সত্য, আমার মন কেমন কেমন করিতেছে, কিন্তু যথার্থ বলিতেছি, কি দুঃখ তাহা জানি না।

বিমলা। তবে কিছু চিন্তা করিতেছ?

সরলা। জানি না, চিন্তা কিছুই নাই, এক একবার মন কেমন কেমন করিতেছে।

সরলা সম্পূর্ণ সত্যকথাই কহিতেছিল। মন কিজন্য চঞ্চল হইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারে নাই।

সন্ধ্যা হইল, বিমলা ও সরলা উদ্যান হইতে পুনরায়

দুর্গাভ্যন্তরে আসিলেন। তথায় আসিয়া বিমলা সরলাকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে লাগিলেন ও নানারূপ অপরূপ ও বহুমূল্য সামগ্রী দেখাইতে লাগিলেন। আপনার শয়নাগারে লইয়া যাইলেন, তথায় একটী ময়নাপাখী ছিল, সে কথা কহিতে পারিত।

বিমলা সরলাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—বল দেখি এ কে? পাখী বলিল—এ কে?

বিমলা। তুই বল্ না, আমি বল্‌ব কেন?

পাখী। বল্‌ব কেন।

বিমলা। তবে বুঝি তুই জানিস্ না।

পাখী। তুই জানিস্ না।

বিমলা। বল্ দেখি, সরলা বাহিরের মেয়ে, না বাড়ীর মেয়ে?

পাখী। বাড়ীর মেয়ে।

বিমলা। পার্‌লিনি, দূর বাঁদী।

পাখী। দূর বাঁদী।

সরলা পাখীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল—আমি কি এই বাড়ীর মেয়ে?

পাখীর কতদূর বিদ্যা বিমলা তাহা জানিতেন, পাখীকে যে কথাগুলি বলা যাইত, সে তাহার শেষ দুইটী কথা উচ্চারণ করিতে পারিত।

তাহার পর বিমলা সরলাকে অন্য একটী কক্ষে লইয়া যাইলেন। কক্ষ দেখিবামাত্র সরলার বিষণ্ণতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল, হঠাৎ অন্যমনস্কা হইয়া সে ভাবিতে লাগিল। বিমলা স্নেহভরে বলিলেন—আইস, আবার চিন্তা কেন?

সরলা উত্তর করিল—আমার মন আরও কেমন করিতেছে, যেন স্বপ্ন দেখিতেছি, মা কোথায়?

বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, সরলার চক্ষুতে জল, নিস্তব্ধে তাহাকে মাতার নিকট লইয়া গেলেন। সরলা দ্রুতবেগে মাতার নিকট যাইয়া অশ্রুপরিপূর্ণনয়নে মাতার বক্ষঃস্থলে লুকাইল।

মহাশ্বেতা অতিশয় ঔৎসুক্য ও স্নেহের সহিত সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা, কি হইয়াছে?

সরলা উত্তর করিল—মা, আমি জানি না, এ বাটীতে কি আছে, আমি আজ সমস্ত দিন যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। সকল দ্রব্যই যেন দেখিয়াছি বোধ হইতেছে। একটা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র যেন এক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মা, আমি পাগলিনী, সহসা সেই মূর্ত্তিকে পিতা বলিয়া ভাবিলাম। মা, আমি অজ্ঞান, কিম্বা স্বপ্ন দেখিতেছি।

মহাশ্বেতা আর শুনিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। অজ্ঞান বালিকার কথায় অদ্য তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে মহাশ্বেতা কন্যাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন—সরলা, এ স্বপ্ন নহে, পূর্ব্বস্মৃতি তোমার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, যে কথা আমি এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, যে কথা তুমি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ বোধ করিয়াছিলাম, সে কথা আপনা হইতেই তোমার অন্তরে উদয় হইতেছে, আর আমি তোমার নিকট কিছু লুকাইব না।

এই বলিয়া মহাশ্বেতা আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সরলার নিকট বলিলেন। সরলার জন্মকথা, রাজা সমরসিংহের সম্মান ও গৌরবের কথা, তাঁহার অন্যায় মৃত্যুর কথা, আপনাদিগের পলায়ন ও ছদ্মবেশের কথা, এ সমস্ত কথা বালিকার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। সেই সকল কথা প্রথমে সরলার স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোহজাল অপসারিত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে দুই একটা কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ঘর, দালান, স্তম্ভ দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বকথা জাগরিত হইতে লাগিল।

মহাশ্বেতার লৌহহৃদয়ও অদ্য দ্রবীভূত হইতেছিল, মাতা কন্যায় পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

বিমলা পার্শ্বে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত, নয়ন হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তাঁহার মনের ভাব পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিবেন। শকুনি যে কতদূর পামর, পিতাকে যে কতদূর পাপকর্ম্মে লিপ্ত করিয়াছে, কি জন্য মহাশ্বেতাকে বন্দী করিয়াছে, এ সমস্ত চিন্তা মহা-বাত্যার ন্যায় তাঁহার হৃদয় আহত ও ব্যথিত করিতেছিল।

বিমলা সহসা চিন্তাস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—মাতঃ, পামর শকুনির পাপ আমি এতদিনে জানিলাম, এ বিশ্বসংসারে উহার মত পাতকী আর নাই, নরকেও উহার মত কীট নাই। কিন্তু উপরে ভগবান্ আছেন, এ ভীষণ পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আছে।

এই গম্ভীর কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা বলিলেন—বৎস বিমলা, ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার লীলাখেলা আমরা বুঝিতে পারিনা, না হইলে এ সংসারে পাপের জয় কি জন্য ?

বিমলা পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন—মাতঃ, আমার কথা অবধারণা করুন। পাপের জয় ক্ষণস্থায়ী মাত্র, পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই। আমি এই পামরের মৃত্যুর উপায় দেখিতে পাইতেছি, আপনার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিহিংসার বিলম্ব নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণীর রত্ন।

Has sorrow thy young days shaded
  As clouds o'er the morning fleet?
Too fast have those young days faded
  That even in sorrow were sweet?
Does time with his cold wings wither
  Each feeling that once was dear?
Come, child of misfortune! come hither,
  I'll weep thee tear for tear!

Moore.

সন্ধ্যার সময় মহাশ্বেতা পূজার্থ যমুনাতীরে গমন করিলেন, শকুনির তাহাতে আপত্তি ছিল না। যে দুর্গে তাঁহার যৌবনাবস্থা, তাঁহার সুখের দিন গত হইয়াছিল, যথায় তিনি রাজকুলচূড়ামণি সমরসিংহের রাজমহিষী হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন, আজি সেই দুর্গের পার্শ্বে হীন, নিরাশ্রয় বিধবা বন্দী হইয়া উপাসনা করিতেছেন। পূর্ব্বে দুর্গপার্শ্বে যে তরঙ্গময়ী যমুনা

গল্প শুনিতে শুনিতে বিমলার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল; পিতার পাপকর্ম্মে হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা হইতে লাগিল, শকুনির চক্রান্তে তাঁহার শরীর কোপে কণ্টকিত হইতে লাগিল। অতি স্নেহসহকারে দুই বাহুদ্বারা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া বিমলা বার বার সেই বালিকার মুখে সেই দারিদ্র্যের কথা, সেই পল্লীগ্রামে নিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার চক্ষুজলে সরলার নয়ন, বদনমণ্ডল ও কেশরাশি সিক্ত করিলেন।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা যখন রুদ্রপুরে ছিলে, তখন তোমাদের বন্ধু কে ছিল? কৃষকপত্নীরাই কি তোমাদের বন্ধু ছিল?

সরলা বলিল—মা কাহারও সহিত অধিক কথা কহিতেন না, দিবাভাগে প্রায় চিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিতেন। আমার সহিত দুই এক জন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের আলাপ ছিল। অমলা নামে এক মহাজনের স্ত্রী ছিল, তাহারই সহিত অধিক সময় আমার কথাবার্ত্তা হইত।

বিমলা। সে কি জাতি?

সরলা। জাতিতে কৈবর্ত্ত।

বিমলা। সে তোমাকে ভালবাসিত, তোমাকে যত্ন করিত?

সরলা। বোধ হয়, আমার মাতা ভিন্ন আর কেহ আমাকে সেরূপ ভালবাসিতে পারে না, তাহার কথা মনে হইলে চক্ষুতে জল আসে।

বিমলা। সরলা, তোমাদের প্রতি কিরূপ অন্যায় করা

হইয়াছে তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। যদি আমার সাধ্য থাকে, আপনি ভিখারিণী হইয়াও তোমাদের পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখিব।

সরলা। আমি সত্য বলিতেছি, পল্লীগ্রামে সেরূপ অবস্থায় আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, কিন্তু মাতা দিবারাত্রি চিন্তা করিতেন, সেইজন্য আমার দুঃখ হইত। মাতাকে সুখে রাখ, এই আমার ভিক্ষা।

বিমলা। সরলা, আমারও সেই ইচ্ছা, প্রাণ দিয়াও যদি তোমার মাতাকে সুখে রাখিতে পারি, তাহাতেও সম্মত আছি।

সরলা। কেন, তোমার অসাধ্য কি? তোমাদের এত ধন, এত মানসম্ভ্রম!

বিমলা। সরলা, তুমি আমার সকল কথা জান না, যদি জানিতে, তবে আমাকে তোমা অপেক্ষাও হতভাগিনী বোধ করিতে। এ ধন মান আর আমাদের নহে।

সরলা। কেন?

বিমলা। আমি প্রাতঃকালেই বলিয়াছিলাম যে পামর শকুনি আমার পিতার প্রাণসংহার করিয়া এই দুর্গ ও জমীদারী হস্তগত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। দিবারাত্রি পিতার চিন্তায় আমার নিদ্রা হয় না। কিন্তু কেবল সেই দুঃখ নহে।

সরলা। আর কি?

বিমলা। সরলা, তোমার নিকট কিছুই লুকাইব না। এই পামর আমাকে বিবাহ করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতার

মৃত্যুর পর অনায়াসে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে। আমার বলিতে লজ্জা করে, এই পামর কয়েকদিন অবধি প্রত্যহই বিবাহের প্রস্তাব করিতেছে। আমি অস্বীকার করাতে সে বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিতে চাহে। কল্য প্রত্যূষে সেই নরঘাতক যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সরলা, আমা অপেক্ষা হতভাগিনী আর কে আছে?

সরলা বিস্মিত হইল, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিল—কাল পরিত্রাণ পাইবে কিরূপে?

বিমলা অতি গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—কল্য জগদীশ্বর আমাকে উদ্ধার করিবেন, তাঁহার কৃপায় কল্য পরিত্রাণের আশা আছে। তাহার পর নিশিযোগে পিতার নিকট পলায়ন করিব, তাহারও উপায় স্থির হইয়াছে। তাহার পর পামরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহারও উপায় পাইয়াছি। ভগবান্, এই দুরূহ কার্য্যে অবলার সহায় হও।

সরলা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, বিমলা আরও বলিতে লাগিলেন—মুঙ্গের যাইয়া পিতার পরিত্রাণ করিব, পাপীর শাস্তি দান করিব। তাহার পর পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া এই দুর্গ মহাশ্বেতাকে পুনরায় দান করিব। আমি পিতার অন্তঃকরণ জানি, শকুনির পরামর্শ হইতে মুক্ত হইলে তিনি ন্যায় কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিবেন না। আর মুঙ্গেরে এক বীর পুরুষ আছেন, তিনিও বোধ হয় আমার সহায়তা করিবেন। ইন্দ্রনাথ! সত্য পালন করিও।

"ইন্দ্রনাথ" নাম শুনিয়া সরলা চমকিত হইল, সহসা তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, বিমলা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন—সরলা, তুমি অমন করিয়া উঠিলে কেন? তুমি বেদনা পাইয়াছ?

সরলা কোন উত্তর করিতে চাহে না, মুখ গোপন করিয়া রাখে। কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসায় বলিল—ইন্দ্রনাথ নামক আমার পরিচিত একজন লোক আছেন, তিনিও পশ্চিম যাত্রা করিয়াছেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিমলার নিকট কোন কথা গোপন রহিল না। বিমলা সরলার নিকট হইতে একটী একটী করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলেন। ইন্দ্রনাথ সরলার হৃদয়েশ্বর, ইন্দ্রনাথ সরলার প্রণয়ী, ইন্দ্রনাথ মহাশ্বেতা ও সরলার উদ্ধারার্থ দুই তিন মাস হইল পশ্চিম গিয়াছেন—তবে কি সেই ইন্দ্রনাথকেই বিমলা মহেশ্বর মন্দিরে দেখিয়াছেন? বিমলার হৃৎকম্প হইল, তিনি ধীরে ধীরে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—

সরলা, সেই বীরশ্রেষ্ঠের শরীরের কোন স্থানে কোন বিশেষ চিহ্ন আছে, লক্ষ্য করিয়াছ? সরলা উত্তর করিল—তাঁহার বাম হস্তে একটী নিবিড় কৃষ্ণ যৌতুক চিহ্ন আছে।

বিমলার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, ইন্দ্রনাথের হস্তে সে চিহ্ন তিনিও দেখিয়াছেন!

নীরবে বিমলা পাশ ফিরিয়া শুইলেন, তাঁহাকে নিদ্রিতা বিবেচনা করিয়া বালিকা সরলাও ঘুমাইল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের বরকন্যা।

"O! do not tempt," she said,
"O! do not add to my distress,
I have tasted much of bitterness."
* * *
But ah, fair maid, thou plead'st in vain,
His heart is proof to prayers,
Albeit like darksome floods of rain
Thou shedst thy scalding tears.

S. C. Dutt.

রাত্রি প্রভাত হইল। আজ বিমলার পক্ষে ভয়ানক দিন। কিন্তু বিমলা বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে বিমলা শয্যাগৃহ হইতে অন্য একটী গৃহে যাইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা করিতে লাগিলেন, অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা কপোলদেশ প্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল।

উপাসনা সাঙ্গ করিয়া বিমলা বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন, শকুনি তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, গায়ের রক্ত শুকাইয়া গেল।

শকুনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিমলার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্প যেরূপ ভেককে ভক্ষণ করিবার অগ্রে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ শকুনি বিমলার দিকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিমলাও নিস্পন্দশরীরে দণ্ডায়মান হইয়া ভূমির দিকে একদৃষ্টে চাহিতে ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভয়ে ও ক্রোধে জর্জ্জরীভূত হইতেছিল। অবশেষে মৃদুস্বরে কহিলেন—শকুনি, আমি হতভাগিনী, আমার মত হতভাগিনী আর নাই, আমাকে আর দুঃখ দিও না, ক্ষমা কর।

সে বচনে পাষাণও দ্রবীভূত হইত, শকুনির হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—এইজন্য বুঝি সময় চাহিয়াছিলে?

বিমলা। আমাকে সময় দিয়াছিলে বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর, আমার হৃদয়ে যে কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শকুনি, আমাকে ক্ষমা কর।

শকুনি। বিবাহের আগে সকল বালিকাই ঐরূপ বলে, শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় সকলেই কাঁদে, কিন্তু একবার গেলে আর বাপের বাড়ী আসিতে চাহে না।

বিমলা। শকুনি, উপহাস করিও না, আমি হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছি, উপহাস ভাল লাগে না।

শকুনি। আমি উপহাস করিতে আইসি নাই। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা পালন করিতে সম্মত আছ কি না?

বিমলা। আমি কোন প্রতিজ্ঞা করি নাই।

শকুনি। প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাক, আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ কি না?

বিমলা। জীবন থাকিতে সম্মত হইব না।

শকুনি। আর আমার দোষ নাই, এক্ষণে বলপ্রকাশ করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

বিমলা। আমার পিতা থাকিলে তুমি এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। পিতার অবর্ত্তমানে, রক্ষাকর্ত্তার অবর্ত্তমানে, নিরাশ্রয় অবলার উপর অত্যাচার করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে।

শকুনি। আমি বালিকার নিকট ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শিখিতে আইসি নাই।

বিমলা। তথাপি আমার কথা অবধারণ কর। দেখ, আমার পিতা তোমাকে কত অনুগ্রহ করেন, তোমাকে দরিদ্রাবস্থা হইতে পুত্রের মত লালনপালন করিয়াছেন, তোমাকে অদ্যাপি পুত্রের মত যত্ন করেন। তাঁহার কন্যার প্রতি অত্যাচার করা তোমার বিধেয় নহে।

শকুনি আপনার পূর্ব্বকার দরিদ্রাবস্থার কথা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—তোমার পিতা সহস্র পাপ করিয়াও যে আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন, সে আমার অনুগ্রহে।

পিতার নিন্দাবাদে বিমলা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আরক্ত নয়নে কহিলেন—তুমিই আমার পিতার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তুমিই আবার তাঁহাকে তিরস্কার কর? কুক্ষণে ভৃত্যের বেশে এই দুর্গে আসিয়াছিলে, এক্ষণে প্রভু হইতে চাহ? ভৃত্যের সহিত বিবাহে বিমলা কখনও সম্মত হইবে না।

শকুনি। কাহার সম্মুখে এরূপ কথা কহিতেছ জান? তোমার জীবন মরণ, তোমার পিতার জীবন মরণ আমার হস্তে, তাহা জান?

বিমলা। জানি—সতীশচন্দ্রের কন্যা সতীশচন্দ্রের ভৃত্যের সহিত কথা কহিতেছে, সে দিন যে নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্র অন্নের জন্য পিতার নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাহারই সহিত আমি কথা কহিতেছি।

বিমলা স্বভাবতঃ মানিনী, পিতার নিন্দা কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার নয়নদ্বয় জ্বলিতেছিল, আলুলায়িত কেশ কপোলে ও উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর পড়াতে তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেছিল। সে অপরূপ আকৃতি দেখিয়া শকুনিও কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন ও ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলা ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—

আমার মিথ্যা রাগ, শকুনি, আমি জানি আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীনে আছি। তোমাকে যে ভৎর্সনা করিলাম সে কেবল ক্রোধে অন্ধ হইয়া। পিতৃনিন্দা আমি সহ্য করিতে পারি না, আমার নিকট পিতার নিন্দা করিও না।

শকুনি। আমি তোমার পিতার নিন্দা করিতে আইসি নাই; তোমার পিতা আমার প্রতি যে দয়া করিয়াছেন তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে যাহার জন্য আসিয়াছি তাহার উত্তর কি?

বিমলা। আমি জীবন থাকিতে তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।

শকুনি। বিমলা তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী। আমার হৃদয়ে দয়া, ক্রোধ, দুঃখ প্রভৃতি নানারূপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া আমার মনস্কামনা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেছ; বিমলা, তাহা পারিবে না। আমি যে কর্ম্মে যখন দৃঢ়ব্রত হইয়াছি, জগৎ-সংসারে কোন লোকেই আমাকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিতে পারে নাই। তুমি বালিকা হইয়া যে এত দিন আমাকে এই বিবাহ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু আর পারিবে না। অদ্যই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে, সকল আয়োজনই প্রস্তুত আছে। তুমি বাধা দিলেই বল প্রকাশ করিব, তবে মিথ্যা আর কি জন্য আপত্তি কর, আইস, দুইজনে নীচে যাই।

এই কথা শুনিয়া বিমলা একেবারে জ্ঞান শূন্য হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অজ্ঞানের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া বলিলেন—পিতা, এ বিপত্তির সময় সহায় হও।

শকুনি। তোমার পিতা মুঙ্গেরে, তোমার বৃথা প্রার্থনা।

বিমলা। তবে জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও, এই বলিয়া বিমলা হস্ত জোড় করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেশরাশিতে বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়াছে, বেশভূষা বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, নয়নদুটী জলে পরিপূর্ণ অথচ অপার্থিব জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বিমলা বলিলেন—জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও।

সে আকৃতি দেখিয়া শকুনি আবার নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান

হইলেন। একদৃষ্টে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন—

শকুনি, তুমি জগদীশ্বরকে ভয় কর, এ পৃথিবীতে এত পাপ করিয়াছ, অবশ্যই জগদীশ্বরকে ভয় কর। আমি তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার ভ্রাতাস্বরূপ, আমি তোমার ভগিনীস্বরূপা, তুমি আমার পুত্রের স্বরূপ, আমি তোমার মাতার স্বরূপা, আমাকে বিবাহ করিতে চাহিও না।

জগদীশ্বরের পবিত্র নামে কোন্ পাপীর হৃদয় কম্পিত না হয়? শকুনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, হত-ভাগিনি! নির্ব্বোধ! দেখিব, কে তোর সহায় হয়। একদণ্ড সময় দিলাম, এক দণ্ডের পর এ কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

এক দণ্ড একাকী বসিয়া বিমলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চক্ষু হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এ রোদনের সময় নহে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কয়েক দিন হইতে যে উপায় উদ্ভাবন করিতে ছিলেন তাহাই স্থির করিলেন।

একদণ্ড কাল পরে শকুনি পুনরায় দর্শন দিলেন। বিমলা কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—শকুনি, আমার কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে, তোমার গৃহিণী হইবার জন্য বিধি যদি আমাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহাই হইবে।

শকুনির মুখে আর হাসি ধরে না, তিনি আগ্রহের সহিত বিমলার হাত ধরিলেন। বিমলা তাহাতে আপত্তি করিলেন না, পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন—

শকুনি, আমার একটী মাত্র ভিক্ষা আছে। পিতার রক্ষার

জন্য আমি একটী ব্রত করিতেছি তাহা আর তিন দিনে সমাপন হইবে, এই তিন দিন অবসর দাও, এ ভিক্ষা দানে পরাঙ্মুখ হইও না। শকুনি, এ ব্রত উদ্যাপন না করিয়া আমি বিবাহ করিব না, বরং আত্মঘাতিনী হইব, তুমি আমাকে পাইবে না।

শকুনি ক্ষণেক চিন্তা করিতে লাগিলেন, অগত্যা আর তিন দিনের সময় দিলেন।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী বিমলা পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত পরিচারিকা দ্বারা দুর্গ হইতে এক ক্রোশ দূরে নৌকা স্থির করিয়াছিলেন। এক প্রহর রাত্রির সময় মহাশ্বেতা ও সরলাকে অনেক আশ্বাস দিয়া কয়েকজন অনুচর ও পরিচারিকা লইয়া এক ক্রোশ পদব্রজে যাইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল।
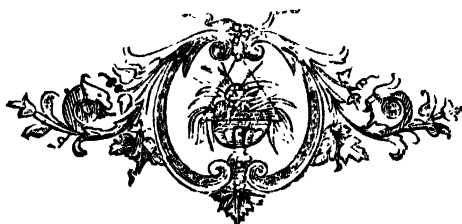
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসন।

And shall my life in one sad tenour run,
And end in sorrow as it first begun.

Pope.

নৌকা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল। উপরে নৈশ আকাশ নীল ও নিস্তব্ধ, চারিদিকে ধান্য ক্ষেত্র ও পল্লীগ্রাম নিদ্রিত ও নিস্তব্ধ, তাহার মধ্য দিয়া বর্ষার বিস্তীর্ণ ও বেগবতী নদীর বক্ষ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষিপ্রগামী নদী ভাসিয়া যাইতেছে! নৌকার ভিতর একটীও দীপ নাই, কোনও প্রকার শব্দ নাই, নৈশ আকাশও জগতের ন্যায় অন্ধকারময় ও শব্দশূন্য!

আকাশ অন্ধকারময়, যত দূর দৃষ্ট হয়, সম্মুখে ও পশ্চাতে নদীর জল ধূ ধূ করিতেছে, রাশি রাশি মেঘ সেই নীল জলে প্রতিফলিত হইতেছে, অল্প বায়ুতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তরঙ্গমালা ও ফেনরাশির মধ্য দিয়া নৌকা কল্ কল্

শব্দে চলিতেছে। উভয় পার্শ্বে কোথাও আম্রকানন নিশাচর-শ্রেণীর ন্যায় নিবিড় অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বায়ুতে গম্ভীর শব্দ করিতেছে, কোথাও বা কতদূর শুভ্র বালুকারাশি বিস্তৃত রহিয়াছে। আকাশে দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, মেঘ ক্রমাগত উড়িতেছে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পশ্চিমদিকে রাশীকৃত হইতেছে। নৌকা কল্ কল্ শব্দে চলিতেছে।

বিমলা নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে কত যে চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল, কে বলিবে? ছয় বৎসরকাল যে দুর্গে অতিবাহিত করিয়াছেন, স্নেহময়ী মাতার যে দুর্গে মৃত্যু হইয়াছে, বাল্যকাল হইতে যে দুর্গে যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজি সেই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সংসার সাগরে ঝাঁপ দিলেন। সে সাগরের কি কূল আছে? বিমলা কি সেই কূল পাইবেন? আশ্রয়হীনা রমণী কি পিতাকে ফিরিয়া পাইবেন? মহাশ্বেতা ও সরলার কি উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন? পাপাচারী শকুনির দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন?

যিনি কখন অনেক দিনের জন্য দেশত্যাগী হইয়া যাত্রা করিয়াছেন, পোতে আরোহণ করিয়া মাতৃভূমির দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু প্রিয় ও সুখকর আছে সজলনয়নে সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন, অল্প বয়সে সহায়হীন বন্ধুহীন প্রবাসী হইয়া অনন্ত সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, তিনিই বিমলার সে রাত্রির ঘোর চিন্তা ও ঘোর দুঃখ অনুভব করিতে পারেন। একাকী নৌকার পশ্চাদ্ভাগে

বসিয়া সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের দিকে দেখিতে লাগিলেন। জলের কল কল শব্দ শুনিতেছিলেন না, আম্রকাননের গম্ভীর শব্দ শুনিতেছিলেন না, তরঙ্গমালার উচ্ছ্বাস ও ফেনরাশির খেলা দেখিতেছিলেন না, ঘোর মেঘের ছটা দেখিতেছিলেন না, কেবল চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ দেখিতেছিলেন, আর অনন্ত ভাবনা ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনার শেষ নাই, আকাশ যেরূপ অনন্ত, নদীর স্রোত যেরূপ অবারিত, সে চিন্তা সেইরূপ অনন্ত ও অবারিত। ভাবিতে ভাবিতে বিমলা চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বভাবতঃ বীরান্তঃকরণ অদ্য দ্রবীভূত হইতে লাগিল। যখন চাহিয়া চাহিয়া আর সে দুর্গ দেখিতে পাইলেন না, কেবল দুর্ভেদ্য তিমিররাশি দেখিতে লাগিলেন, তখন হস্তদ্বয়ে মুখ আবরণ করিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহার অঙ্গুলির মধ্য দিয়া অশ্রুজল বাহির হইয়া বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল একেবারে সিক্ত করিল। শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বিমলা যে নিরাপদে মুঙ্গের পঁহুছিয়াছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয় জানেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ ব্যূহ।

Yet though thick the shafts as snow,
Though charging knights like whirlwinds go,
Though billmen ply their ghastly blow,
Unbroken was the ring.
The stubborn spearmen still made good
Their dark impenetrable wood,
Each stepping where his comrade stood,
The moment that he fell.

Scott.

শত্রুরা এক্ষণও মুঙ্গেরের নিকট বসিয়া আছে, টোডরমল্ল এক্ষণও অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ দিন দিন খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। সুযোগ পাইলেই তিনি আপনার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেন, অল্পসংখ্যক শত্রুসৈন্য কোথাও আছে এরূপ সংবাদ পাইলেই মহারাজের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতেন, অধিক শত্রু

আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গে প্রবেশ করিতেন। বার বার এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শত্রুরা ব্যতিব্যস্ত হইল, দুর্গবাসিগণ নব সেনাপতির রণকৌশল, সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহার বীরত্বের যশ বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

শত্রুরা ভাগলপুর হইতে অগ্রসর হইয়া মুঙ্গেরের নিকটে একটী শিবির স্থাপন করিয়াছিল। এক দিন সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় রাজা টোডরমল্ল শত্রুদিগের শিবির দর্শনার্থ দুর্গের প্রাচীর ছাড়িয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে গিয়াছিলেন। শত্রুর শিবির সেস্থান হইতে অনেক দূরে, সুতরাং কোন ভয়ের কারণ ছিল না। বিশেষ মহারাজ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন ও তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশৎ জন অশ্বারোহী ছিল। অশ্বারোহীগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, রাজা একদৃষ্টে শত্রুর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সহসা দূর হইতে একটী শব্দ শ্রুত হইল। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, দূরে ধূলিরাশি দেখা যাইতেছে, আরও দেখিল, একজন অশ্বারোহী বায়ুবেগে রাজার দিকে ধাবমান হইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন অশ্ব ভূমি স্পর্শ করিতেছে না। সে অশ্বারোহী মুহূর্ত্তমধ্যে নিকটবর্ত্তী হইল, সকলেই চিনিল, সে মহারাজের একজন সৈনিক। রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া সে লম্ফ দিয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইল, অশ্ব এত বেগে দৌড়িয়া আসিয়াছিল যে, অশ্বারোহী অবতীর্ণ হইবামাত্র ঘোটক পড়িয়া গেল ও দুই চারিবার চীৎকার ও শূন্যে পদবিক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ঘোটকের দিকে দেখিবার কাহারও অবকাশ ছিল না।

সৈনিক প্রণাম করিয়া ভীতচিত্তে বলিল—মহারাজ! আমাদের শিবিরস্থ কোন বিদ্রোহোন্মুখ সেনার নিকট হইতে শত্রুরা সংবাদ পাইয়াছিল যে, অদ্য মহারাজ সন্ধ্যার সময় দুর্গপ্রাচীরের বহির্গত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে দুই সহস্র অশ্বারোহী অপেক্ষা করিয়াছিল, সেই দুই সহস্র অশ্বারোহী এক্ষণে আসিতেছে। সৈনিক এইমাত্র বলিয়া শ্রান্তি-বশতঃ ভূমিতে পড়িল।

রাজার অনুচরেরা আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইল। রাজা আজ্ঞা দিলেন—তোমরাও অশ্বারোহী, দুর্গের দিকে ধাবমান হও, শত্রুরা আসিবার অনেক পূর্ব্বেই আমরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিব। সকলেই বেগে দুর্গাভিমুখে অশ্বচালনা করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি ইন্দ্রনাথ দূরে ধূলি দেখিয়াই আপন রণভেরী বাজাইয়াছিলেন, তাঁহার পঞ্চশত অশ্বারোহীও সেই আম্রকানেনের এক অংশে কোন কারণবশতঃ স্থাপিত ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা আসিয়া মিলিত হইল। তখন ইন্দ্রনাথ রাজাকে বলিলেন—মহারাজ! যদি আজ্ঞা পাই, আমার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুদিগকে ক্ষণেক বাধা দিতে পারি। ততক্ষণে আপনারা স্বচ্ছন্দে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—বালক! যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে টোডরমল্ল কখনও পলায়নতৎপর হয় না। বৃথা প্রাণ নষ্ট করা যুদ্ধ নহে, নরহত্যা মাত্র।

সকলে দুর্গের নিকট উপস্থিত হইল। দুর্গের সম্মুখে পরিখা;

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া দেখিল পরিখার উপরিস্থ সেতু ভগ্ন হইয়াছে! যে নরাধম শত্রুদিগকে গোপনে সংবাদ দিয়াছিল, সেই সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; সুতরাং অশ্বারোহীদিগের দুর্গে প্রবেশ করিবার উপায় নাই!

সকলেই সন্তরণ করিয়া পরিখা পার হইবার প্রস্তাব করিল। রাজা শত্রুর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—পার হইতে না হইতে শত্রুরা আসিয়া পড়িবে, তখন কাপুরুষের ন্যায় শত্রুকর্ত্তৃক সকলে আহত হইয়া জলমগ্ন হইবে। বীরপুরুষের কার্য্য কর, শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ দাও, এইক্ষণেই কাষ্ঠের নূতন সেতু নিন্মিত হউক্, যতক্ষণ নির্ম্মিত না হয়, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব। ইন্দ্রনাথ, শত্রুদিগকে যুদ্ধদান কর।

ভৃত্য সাধ্যমত কার্য্য করিবে—বলিয়া ইন্দ্রনাথ ব্যূহনিন্মাণে তৎপর হইলেন। ব্যূহ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি শ্রেণীতে একশত অশ্বারোহী। প্রথম শ্রেণীর পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে তৃতীয় শ্রেণী ইত্যাদি। সুতরাং যুদ্ধের সময় প্রথম শ্রেণী পরিশ্রান্ত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণী অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহাদের পর আবার তৃতীয় শ্রেণী সম্মুখীন হইবে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক শ্রেণীই এক একবার করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে। সম্মুখে শত্রুর আক্রমণ রুদ্ধ হইবে, পশ্চাতে পরিখার জল, সে দিক্ হইতে আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। সেই পরিখার নিকট কয়েক জন দুই চারিটী বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া সেতু বন্ধন করিতেছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শত্রু আসিয়া পড়িল, ইন্দ্রনাথের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল!

আজি প্রায় তিন চারি মাস পর্য্যন্ত মুঙ্গের নগর বেষ্টিত

ছিল, কিন্তু অদ্য যেরূপ দুই পক্ষই ভীষণ সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, এরূপ কখনও দেখা যায় নাই। ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেই রাজা টোডরমল্ল বন্দী হইবেন, এই জ্ঞানে শত্রুরা সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বার বার ভীষণ আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যূহ ভাঙ্গিবার নহে, পর্ব্বতশিখরের ন্যায় বার বার শত্রুদলের তরঙ্গমালা দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শত্রুরা অধিক সংখ্যক বলিয়া তাহাদিগের বড় সুবিধা হইল না, কেননা ইন্দ্রনাথ যেরূপ কৌশলে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে একেবারে এক শত জনের অধিক শত্রু আসিয়া সে ব্যূহ আক্রমণ করিতে পারিল না, বরং সেই অল্প স্থানের মধ্যে দুই সহস্র সৈন্যের চলাচলের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তথাপি শত্রুরা অদ্য বার বার সিংহ গর্জ্জন করিয়া সিংহবিক্রম প্রকাশ করিতেছিল, বীরমদে উন্মত্ত হইয়া বার বার শব্দ করিয়া সেই ব্যূহভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথের সৈন্যেরাও সাহসে হীন ছিল না। অদ্য স্বয়ং রাজা টোডরমল্লের দ্বারা চালিত হইয়া তাহাদিগের উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা ছিল না। ইন্দ্রনাথ তীরের মত ব্যূহের এপার্শ্ব হইতে ওপার্শ্বে, এদিক হইতে ওদিকে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে শত্রুরা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল, সেই সেই স্থানে সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আজি মহারাজ স্বয়ং তোমাদের যুদ্ধ দেখিতেছেন, আজি মহারাজের রক্ষার ভার তোমাদের হস্তে, আজি দিল্লীশ্বরের নাম ও গৌরব তোমরা রক্ষা করিবে।" এইরূপ উৎসাহবচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া

সিংহনাদ করিতে লাগিল, ভৈরব গর্জ্জনে আকাশ ভিন্ন হইল, শত্রুর হৃদয় কম্পিত হইল।

তথাপি দুই সহস্র সৈন্যের সহিত পঞ্চশত সৈন্যের যুদ্ধ সম্ভবে না, ইন্দ্রনাথের সেনাগণ একে একে নিহত হইতে লাগিল, শত্রুদিগেরও অনেক সৈন্য হত ও আহত হইল, কিন্তু দুই সহস্রের মধ্যে এক শত কি দুই শত যুদ্ধে অক্ষম হইলে ক্ষতি নাই। দেখিয়া, রাজা চিন্তিত হইলেন. একবার ইন্দ্রনাথকে অন্তবালে ডাকিয়া বলিলেন—ইন্দ্রনাথ! তুমি আপন সৈন্যদিগকে যেরূপ রণশিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম। কিন্তু সেনাগণ যেরূপ হত ও আহত হইতেছে, ভয় হয় তাহারা রণে ভঙ্গ দিবে।

ইন্দ্রনাথের মুখ রক্তবর্ণ হইল, তিনি বলিলেন—মহারাজ, আমার সৈন্যদিগকে সম্মুখ যুদ্ধ করিতেই শিখাইয়াছি, রণে ভঙ্গ দিতে কখনও শিখাই নাই। যতক্ষণ এক জন অশ্বারোহী থাকিবে ততক্ষণ সম্মুখ যুদ্ধ হইবে।

সন্ধ্যার ছায়ায় যুদ্ধক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে আবৃত হইতে লাগিল কিন্তু সে চমৎকার ব্যূহ ভঙ্গ হইল না! একজন অশ্বারোহী হত হয়, তাহার স্থানে অপর একজন অশ্বারোহী আসিয়া দণ্ডায়মান হয়; সে হত হয়, আর একজন আসিয়া তথায় দণ্ডায়মান। শ্রেণী যত ক্ষীণ হইতে লাগিল, সৈন্যদিগের উৎসাহ ও উল্লাস যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছিলেন, "পলায়ন কাহাকে বলে, তাঁহার সৈন্যেরা শিখে নাই।" শত্রুগণ হতাশ হইয়া একবার বেগে শেষ আক্রমণ করিল, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিল।

দুই সহস্র অশ্বারোহীর সে ভীষণ গর্জ্জন চারিদিকে একক্রোশ পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, দুই সহস্র অশ্বের যুগপৎ পদবিক্ষেপে মেদিনী কম্পিত হইল, কিন্তু সে শব্দে ও সে পদবিক্ষেপে ইন্দ্রনাথের ব্যূহ কম্পিত হইল না। যুদ্ধ সাঙ্গ হইল, সে অপরূপ ব্যূহ ভঙ্গ হইল না।

অবশেষে সেতু নির্ম্মিত হইল। রাজা পরিখা পার হইলেন, রাজা নিরাপদে পার হইয়াছেন শুনিয়া ইন্দ্রনাথের সৈন্যগণ একেবারে সিংহ-গর্জ্জন করিল, সে গর্জ্জন শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিল। তাহারা জানিল, যে জন্য দুই সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বৃথা হইয়াছে।

আক্রমণকারীগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া নীরবে নিজ শিবিরাভি-মুখে প্রস্থান করিল। যতক্ষণ রাজা টোডরমল্ল সেতু পার হইতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দেখিতে ছিলেন। যখন দেখিলেন, রাজা নিরাপদে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপন অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সহসা পড়িয়া গেলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহাকে উঠাইতে আসিয়া দেখিল শত্রুর বর্ষাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভিন্ন হইয়াছিল, শোণিতে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইয়াছিল, বলশূন্যতাবশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি ভূমিতে পতিত হইয়াছেন।

ইন্দ্রনাথের সৈন্যেরা অনেকেই সেতু পার হইয়াছিলেন। শত্রুগণ যাইবার সময় দেখিল, ইন্দ্রনাথ আহত হইয়াছেন। উল্লাসে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রনাথকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। ইন্দ্রনাথ বন্দী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

THE soldier's hope, the patriot's zeal,
For ever dimmed, for ever crossed,
Oh ! who shall say what heroes feel,
When all but life and honor's lost.
The last sad hour of freedom's dream,
And valor's task moved slowly by,
While mute they watched till morning's beam,
Should rise and give them light to die.
There's yet a world where souls are free,
Where tyrants taint not nature's bliss,
If death that world's bright opening be,
Oh ! who would live a slave in this ?

Moore.

শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পর পুনরায়, ইন্দ্রনাথের চেতনার সঞ্চার হইল।

ইন্দ্রনাথ দেখিলেন তাঁহার চারিদিকে শত্রুসমূহ আসীন রহি-

য়াছে। সম্মুখে এক উচ্চ সিংহাসনে মাসুমী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে মহামান্য ওমরাহ ও অমাত্যগণ বসিয়া রহিয়াছেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে টোডরমল্লের বিদ্রোহী সেনাপতি তর্খান ও হুমায়ুনকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথের পশ্চাতে জল্লাদ কুঠারহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, প্রভুর দিকে নিমেষশূন্য লোচনে চাহিয়া রহিয়াছে, আজ্ঞা বা ইঙ্গিত পাইলেই বন্দীর শিরশ্ছেদন করিবে। ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না, তীব্রদৃষ্টিতে মাসুমীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মাসুমীও ইন্দ্রনাথকে সচেতন দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—হিন্দু! তুমি বীরপুরুষ, কিন্তু বিদ্রোহাচরণ করিয়াছ, বিদ্রোহাচরণের দণ্ড শিরশ্ছেদন!

ইন্দ্রনাথ ভীষণস্বরে উত্তর করিলেন—যোদ্ধা মৃত্যুর আশঙ্কা করে না, যাহা ইচ্ছা হয়, করুন, আমি বিদ্রোহাচরণ করি নাই।

মাসুমী ইন্দ্রনাথের উগ্রভাবে কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া বলিলেন—টোডরমল্লের সহিত যোগ দিয়া বঙ্গদেশের জায়গীরদারদিগের সহিত যুদ্ধ করা বিদ্রোহাচরণ নহে?

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন—বঙ্গদেশের অধীশ্বর, সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর আকবরসাহের জন্য আমি বিদ্রোহী জায়গীরদারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি।

সকলেই ভাবিলেন, ইন্দ্রনাথ আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছেন, সকলেই ভাবিলেন, মাসুমী সেইক্ষণেই ইন্দ্রনাথের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিবেন। কিন্তু মহানুভব মাসুমী

অসহায় হিন্দুর এইরূপ নির্ভীকতা দর্শনে কুপিত হইলেন না, বরং আহ্লাদিত হইলেন। ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন—বীর! তোমার উগ্রতা ক্ষমা করিলাম, তোমার বীরত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তুমি বঙ্গদেশের জায়গীরদারদিগকে আর কখন বিদ্রোহী বলিও না। আমরা মোগল সন্তান, আমরা বঙ্গবিজেতা, আমাদের বাহুবলে এ দেশ জয় হইয়াছে, আমরা এদেশের প্রকৃত রাজা।

ইন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন—আপনারা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছেন আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সম্রাট আকবরের প্রতাপে আপনারা সে জয়লাভ করিয়াছেন, সেই সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহাচরণ করিতেছেন। বিধির নির্ব্বন্ধের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেন শোণিতস্রোতে সুন্দর বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন?

মাসুমী। হিন্দু! তোমরা বিধির নির্ব্বন্ধের উপর প্রত্যয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাক, সাহসী মোগলেরা জীবন থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইবে না, অধীনতা স্বীকার করিবে না।

ইন্দ্রনাথ। পাঠানগণও এই কথা বলিয়াছিল, এক্ষণে পাঠান রাজ্য কোথায়! দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে আপনারাও বৃথা যুদ্ধ করিতেছেন, বৃথা রক্তস্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন।

মাসুমী। হিন্দু! তোমার জীবন মৃত্যু আমার হস্তে, তোমার কি জীবনের অভিলাষ নাই যে, আমার সম্মুখে এইরূপ কথা কহিতেছ?

ইন্দ্রনাথ। আমার জীবনের অভিলাষ অনেক আছে, কিন্তু

যখন আপনাদিগের হস্তে পড়িয়াছি, তখন আর জীবনের আশা রাখি না।

মাসুমী। কেন?

ইন্দ্রনাথ। সাহসী পুরুষ শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারেন, যাঁহারা জয় নিশ্চয় জানেন, তাঁহারা শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা নিজের জয় সংশয় করেন তাঁহারা শত্রুকে কখনও ক্ষমা করিতে পারেন না।

অনেকক্ষণ কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের হীনবল শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতেছিল, তাহাতে বক্ষঃস্থল হইতে পুনরায় শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

মাসুমী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন—পামর! কৌশল-বাক্যের দ্বারা ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশা করিও না।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন—আমি কোন প্রত্যাশা করি না, কেবল এই প্রত্যাশা করি যে, জল্লাদ আপন কার্য্য শীঘ্রই নিষ্পন্ন করিবে।

কিন্তু জল্লাদকে সে ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইল না। ইন্দ্রনাথের ক্ষত হইতে রক্তস্রোত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ত্বরায় শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, ইন্দ্রনাথ পুনরায় চেতনাশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

মাসুমীর হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নহে। আহত, বলহীন, চৈতন্যহীন যোদ্ধার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন না। বলিলেন—অধুনা কারাগারে লইয়া যাও।

ইন্দ্রনাথ কারাগারে প্রেরিত হইলেন।
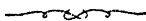
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

রমণীর বীরত্ব।

THE midnight passed, and to the massy door
A light step came—it paused—it moved once more.
Slow turns the grating bolt and sullen key—
'Tis as his heart foreboded—that fair she!

Byron.

একটী ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কারাগারে একজন বীরপুরুষ তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কারাগারের একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া প্রাতঃকালের তরুণ রৌদ্র আসিতেছে, অন্ধকার-রাশি মধ্যে সেই রৌদ্রের রেখা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ সেই রৌদ্ররেখায় খেলা করিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, একবার রৌদ্ররেখায় দেখা যাইতেছে, আবার অন্ধকাররাশিতে লীন হইতেছে। দুই একটী ক্ষুদ্র পক্ষী সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেছে, আবার ক্ষণেক পর উড়িয়া যাইতেছে, তাহারা বন্দী নহে, পক্ষবিস্তার করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতেছে, জগৎ-সংসারে ও

আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে! বীরপুরুষ সেই তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া সেই বাতায়নের দিকে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, অন্ধকারস্থিত লতাপল্লব যেরূপ বাহুবিস্তার করিয়া আলোকের দিকে ধায়, বন্দীর নয়ন সেইরূপ বাতায়নের দিকে রহিয়াছে। বন্দী কি চিন্তা করিতেছেন? রৌদ্ররেখায় পতঙ্গসমূহের খেলা দেখিতেছেন? বাতায়নাগত পক্ষীগণ যখন পুনরায় পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, বন্দীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানসপক্ষ বিস্তার করিয়া সুন্দর জগৎসংসার ও অনন্ত নীল আকাশে পর্য্যটন করিতেছেন?

ইন্দ্রনাথ এ সকল চিন্তা করিতেছেন না। তাঁহার হৃদয়ে অন্য চিন্তার উদ্রেক হইতেছে। ইন্দ্রনাথ যোদ্ধা, যোদ্ধার মৃত্যুতে ভয় নাই। কিন্তু তিনি মরিলে অন্যের কি ক্লেশ হইবে, সেই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ এই বার্দ্ধক্যে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিলে জীবন ত্যাগ করিবেন। নগেন্দ্রনাথের আর কেহই নাই, ভার্য্যা নাই, কন্যা নাই, অন্য পুত্র নাই, বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রের উপর চাহিয়া জীবনধারণ করিতেছিলেন, সেই পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলে বৃদ্ধ প্রণত্যাগ করিবেন। নগেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য হইবে।

আর সেই অজ্ঞান বালিকা, সেই প্রেমবিহ্বলা সরলা সেই সহায়হীনা, সম্পত্তিহীনা, কুটীরবাসিনী সরলা, তাহারই বা কি দশা ঘটিবে? ইন্দ্রনাথ সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে যাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে সপ্তম পূর্ণিমা অতীত হইবে, বালিকা আশানেত্রে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে নয়ন মুদিত করিবে,

জীবন অভাবে অপরিস্ফুট পুষ্পের ন্যায় নীরবে অসময়ে শুকাইবে। চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, নয়ন দৃষ্টিশূন্য হইল, বলিলেন—ভগবন্! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, বিধির নির্ব্বন্ধে যাহা আছে হউক, আমি আর এ চিন্তাযাতনা সহ্য করিতে পারি না।

শত্রুদিগের মধ্যে ইন্দ্রনাথকে পীড়ার সময় যত্ন করে এরূপ কেহই ছিল না। কারাগারের পার্শ্বে প্রহরীগণ নিঃশব্দে খড়্গহস্তে দিবারাত্রি দণ্ডায়মান থাকিত। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একজন ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিত, আহার সাঙ্গ হইলে একমাত্র দাসী নিঃশব্দে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া যাইত। ইহা ভিন্ন আর কেহই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। শত্রুশিবিরের মধ্যে ইন্দ্রনাথের কেবল একমাত্র বন্ধু ছিল। যে দাসী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই কারাগৃহ পরিষ্কার করিতে আসিত, সেই ইন্দ্রনাথের দুঃখে যথার্থ দুঃখিনী। প্রত্যহ নীরবে আসিয়া নীরবে প্রস্থান করিত বটে, কিন্তু সেই বীরের দুঃখ দেখিয়া সে অন্তরালে অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিত। নির্দ্দয় শত্রুগণ বন্দীকে অতিশয় কষ্টে রাখিত, শয়নের জন্য ভূমিতে কেবলমাত্র তৃণশয্যা রচণা করিত, দাসী ইন্দ্রনাথের জন্য আপন বস্ত্র দ্বারা সেই তৃণশয্যা মণ্ডিত করিয়া যাইত। শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে দিনের মধ্যে কেবল একবার মাত্র অপকৃষ্ট আহার দিত, দাসী আপনি অনাহারে থাকিয়া ইন্দ্রনাথকে নানাপ্রকার সুপথ্য আনিয়া দিত। শত্রুগণ ইন্দ্রনাথের চিকিৎসা করাইত না, দাসী তাঁহার ক্ষতগুলি জলে ধৌত করিয়া পুনরায় পরিষ্কার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিত এবং ঔষধি আনিয়া

দিত। সেই করুণা-জলসেচনে ইন্দ্রনাথের ক্ষত আরাম হইতে লাগিল, তিনি দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনাথ প্রায় আপন চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি সময়ে সময়ে দাসীর যত্ন ও মমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কারাগৃহের অন্ধকারে দাসীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন না, কোন কথা কহিতে চাহিলে দাসী ধীরে ধীরে প্রহরীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিত। ইন্দ্রনাথ আবার নিস্তব্ধ হইয়া আপন চিন্তায় অভিভূত হইতেন।

প্রহরীগণ দাসীর এই স্বাভাবিক মমতা দেখিয়া কখন কখন উপহাস করিয়া বলিত—এ বিবি, এ হিন্দু কি তোমাকে সাদী করিবে? এরূপ উপহাসে দাসী বিরক্ত হইত না, কখন কখন অতি নম্র ভাবে উত্তর দিত, কখন কখন প্রহরীদিগকে সুরাপান করিতে দিত, সুতরাং সকল প্রহরীই দাসীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান হইয়া চৌকি দিবার সময় সেই নব প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সুন্দরী দাসীর কথা ভাবিত, নিদ্রার সময়ে সাকী ও সুরাপেয়ালার স্বপ্ন দেখিত।

অদ্য রজনীতে দাসী রক্ষকদ্বয়কে সুরাপান করিতে দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল, দাসী সুরা লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া প্রহরীদ্বয়ের মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে সুরা মস্তকে উঠিতে লাগিল, রজনী দ্বিপ্রহরের মধ্যে প্রহরীদ্বয় অজ্ঞান অবস্থায় শয়ন করিয়া সুরাপেয়ালা ও সাকীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দাসী কারাগারে প্রবেশ করিল।

ঘরের ভিতর তৃণশয্যায় বীরপুরুষ নিদ্রিত রহিয়াছেন।

ইন্দ্রনাথের ললাট পরিষ্কার, ওষ্ঠে হাসির চিহ্ন—এ দুঃখ-সাগরে তিনি কি সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন? দেখিতেছেন, যেন আজি পূর্ণিমা, যেন অদ্য তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পুনরায় রুদ্রপুরে গিয়াছেন, যেন বহুদিন পরে হৃদয়ের সরলাকে পাইয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, যেন সরলার আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতেছে। সহসা ইন্দ্রনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চমকিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার তৃণশয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একজন নারী যথার্থই রোদন করিতেছে, কারাগৃহের সেই দাসী নীরবে দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে!

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। দাসীর মায়া ও মমতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, আপনি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন—হতভাগার দুঃখে তুমি কি জন্য দুঃখিনী? আমার আর জীবনের আশা নাই, পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন।

দাসী উত্তর করিল না, নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ আবার বলিলেন—এ অসময়ে তুমি আমার প্রতি যে মমতা প্রকাশ করিলে জগদীশ্বর তজ্জন্য তোমাকে সুখে রাখিবেন। আমি তোমাকে কিছু দিয়া পুরস্কার করি এরূপ আমার কিছুই নাই, আমি বন্দী। এই সুবর্ণের অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ কর, আমার বিপদ ও পীড়ার সময় যেরূপ শুশ্রূষা করিলে, মুসলমানদিগের হস্তে আমার মৃত্যু হইলে পর এই অঙ্গুরীয়টী দেখিয়া এক একবার আমার কথা স্মরণ করিও।

দাসী অনেকক্ষণ কোনও উত্তর করিল না, অনেকক্ষণ

অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে নীরবে হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করিল, নীরবে সেটী আপনার গলার কণ্ঠমালায় বাঁধিয়া রাখিল। কতক্ষণ পরে চক্ষুর জল মোচন করিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—সৈনিকবর! আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, তাহারই চিহ্ন স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী গ্রহণ করিলাম, তাহারই স্মরণার্থ এটী আজীবন ধারণ করিব। সেনাপতি ইন্দ্রনাথ বোধ হয় দাসীকে বিস্মৃত হইয়াছেন।

সে কোকিলবিনিন্দিত স্বরে ইন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন, শয্যায় একেবারে উঠিয়া বসিলেন! বনগ্রামের মহেশ্বরমন্দিরে সে স্বর একবার শুনিয়াছিলেন, গঙ্গাবক্ষের উপর নৌকা মধ্যে সে স্বর আর একবার শুনিয়াছিলেন! গঙ্গার জলমগ্ন হইবার সময় যে নারী ইন্দ্রনাথকে একবার উদ্ধার করিয়াছিলেন, অদ্য সেই নারী, সেই বিমলা, দাসীবেশ ধারণ করিয়া শত্রুশিবির হইতে ইন্দ্রনাথকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন!

চিন্তা তরঙ্গমালার ন্যায় ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে উথলিত হইতে লাগিল, তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইল, নয়ন দুইটী জলে পূর্ণ হইল। শেষে বিমলার হস্ত দুটী ধরিয়া করুণস্বরে বলিলেন—মানবী কি দেবী! আপনি কে আমি জানিনা, কিন্তু বিপদকালে আপনি আমার চির সহায়! এই বিপদপূর্ণ শত্রুশিবিরে আপনি আমার উদ্ধারার্থ একাকিনী আসিয়াছেন, আপনাকে দাসী বলিয়া আমি কথা কহিয়াছি, আমার জীবনদান করিয়াছেন তজ্জন্য তুচ্ছ অর্থ পুরস্কার দিতে চাহিয়াছি, এ সকল অপরাধ কি আপনি মার্জ্জনা করিবেন?

ইন্দ্রনাথের কথাগুলি যেন বিমলার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল, ইন্দ্রনাথের হস্তসংস্পর্শে বিমলার শরীর কাঁপিতে লাগিল, গাত্র কণ্টকিত হইল! কিন্তু বিমলা প্রত্যুৎপন্নমতি; যত্নে আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত সরাইয়া লইলেন ও ধীরস্বরে উত্তর করিলেন— সৈনিকবর, আপনার অপরাধ নাই, আমি দাসী বেশে আসিয়াছি, আপনি আমাকে দাসী বিবেচনায় যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। আপনি যে পুরস্কার দিয়াছেন তাহা আমি আজীবন হৃদয়ে ধারণ করিব, আজি যে আমার প্রতি একটু স্নেহ প্রকাশ করিলেন আজীবন তাহা স্মরণ রাখিব। কিন্তু এক্ষণে এ সমস্ত কথা কহিবার অবসর নাই, এক্ষণে অন্য কথা বলিতে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি আপনার উদ্ধারের উপায় সংকল্প করিয়াছি, কারাগৃহের প্রহরীদ্বয় চৈতন্যশূন্য হইয়াছে, আপনি এই রমণীর বেশ ধারণ করিয়া চলিয়া যাউন। কারাগৃহের বাহিরের সৈনিকগণ যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, বলিবেন—আমি ভিখারিণী দাসী।

ইন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, বিমলার সাহস ও স্থিরসঙ্কল্প দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন—দেবি! ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছুক নহি। আপনি এই-রূপে আমার উদ্ধার করিয়াছেন জানিলে নৃশংস শত্রুগণ আপনাকে প্রাণে বধ করিবে।

বিমলা বলিলেন—আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমার

উদ্ধারের উপায় আছে, উদ্ধার না হইলেও অধিক ক্ষতি নাই। আমার জন্য চিন্তা করিবে, আমার জন্য শোক করিবে, জগতে এরূপ অধিক লোক নাই। অনন্ত সাগরের মধ্যে একটী জলবিম্ব যেরূপ লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই জগৎসংসারে একজন হত-ভাগিণীর মৃত্যু অশ্রুত, অলক্ষিত থাকিবে। আপনি যশস্বী, ক্ষমতাশালী, বীরপুরুষ, আপনি সুখে থাকিলে অনেকে সুখে থাকিবে।

ইন্দ্রনাথ বিমলার প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অব-শেষে ধীরভাবে বলিলেন—দেবি! আপনি আমার উদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছেন, তাহার জন্য আমি আজন্মকাল আপনার নিকট বাধিত রহিলাম; কিন্তু আপনাকে এই স্থানে রাখিয়া আমি কারাগার ত্যাগ করিব না, উপরোধ করিবেন না।

এবার বিমলা পরাস্ত হইলেন। অনেক অনুরোধ করিলেন, অনেক কারণ দর্শাইতে লাগিলেন, কিছুতেই বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রনাথের একই উত্তর, যিনি আমাকে একবার প্রাণদান করিয়াছেন, পুনরায় আমার উদ্ধারের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া আমি উদ্ধার প্রার্থনা করিনা, এরূপ উদ্ধারে, এরূপ জীবনে, আমার কায নাই।

অবশেষে বিমলা অতিকষ্টে বলিলেন—বীরপুরুষ! আপনি বোধ হয় জানেন না যে আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী সরলা আজি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে আবদ্ধ রহিয়াছেন। আপনি যদি শীঘ্র তাঁহার উদ্ধার না করেন, পামর শকুনি নিজের একজন ভৃত্যের সহিত সরলার বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছে!

ইন্দ্রনাথ সহসা বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ললাট হইতে স্বেদ-বিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। বিমলা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন, ইন্দ্রনাথ নীরবে শুনিলেন, নীরবে হস্তের উপর ললাট ন্যস্ত করিয়া অধোবদনে রহিলেন। মস্তকে শিরা স্ফীত হইতেছিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন—ভদ্রে! আপনার কথাই থাকিবে, আমি পলায়ন করিব, কিন্তু একটী প্রতিজ্ঞা করুন।

বিমলা। কি প্রতিজ্ঞা?

ইন্দ্রনাথ। যদি কল্য আপনার উদ্ধারের উপায় না হয়, যদি নৃশংস শত্রুরা আপনার বধের আজ্ঞা দেয়, অঙ্গীকার করুন মাসুমীর নিকট তিন দিবসের সময় প্রার্থনা করিবেন! আমি মাসুমীকে বিলক্ষণ জানি, অবলার এ যাচ্ঞায় কখনই অস্বীকৃত হইবেন না। তিন দিনের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে।

বিমলা তাহাই প্রতিশ্রুত হইলেন।

তখন বিমলা ইন্দ্রনাথকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন। ইন্দ্রনাথ আপনার নূতন রূপ দেখিয়া হাসিলেন। আবার বিমলার দিকে চাহিলেন, উদ্বেগের সহিত বিমলার হস্ত দুইটী আপনার দুই হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন—

ভদ্রে! দুইবার আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন, জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমি আপনার এ ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিব। এই কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের উষ্ম নিশ্বাস বিমলার বাহু-লতার উপর পড়িল, ইন্দ্রনাথের

ওষ্ঠদ্বয় বিমলার করপল্লব স্পর্শ করিল। বাতাহত পত্রের ন্যায় বিমলার গাত্র কাঁপিতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ইন্দ্রনাথ অদৃশ্য হইলেন, বিমলা ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া সেই অন্ধকারময় কুটীরে বসিয়া পড়িলেন। নৈশ জগৎ দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিমলার নারীহৃদয়ও দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরুষের বীরত্ব।

HEARD ye the din of battle bray,
Lance to lance and horse to horse.

Grey.

ইন্দ্রনাথকে সহসা শিবিরে দেখিয়া তাঁহার অধীনস্থ সেনা-দিগের বিস্ময় ও আহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু ইন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার অধীনস্থ অশ্বারোহীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হও, এই-ক্ষণেই নিঃশব্দে শত্রুশিবির আক্রমণ করিব।

সৈন্যেরা বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ এই অবসরে ভগবানের নাম লইলেন। দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—ভগবন্! অদ্যকার মত অসমসাহসী কার্য্যে আমি কখনও লিপ্ত হই নাই, অদ্য প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিজয়লাভ করিতে দিন, আমার উপকারিণীর উদ্ধার সাধন করিয়া যদি প্রাণে হত হই, ক্ষতি নাই।

রজনী তিন প্রহর অতীত হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, চারিদিকে গভীর অন্ধকার। আকাশে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, আবার মেঘরাশিতে আবৃত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে পেচকের ভীষণ শব্দ শুনা যাইতেছে, নিকটস্থ গঙ্গার ভীম কল্লোল শ্রুতিগোচর হইতেছে। সে গভীর অন্ধকারে ইন্দ্রনাথের সেনা নিঃশব্দে শত্রুশিবিরাভিমুখে চলিল।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে দূর হইতে একটা আলোক দৃষ্টিগোচর হইল, সে আলোক একবার দেখা যায়, অন্যবার নির্ব্বাণপ্রায় হয়। ইন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন, একজন দূতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। দূত নিঃশব্দে যাইয়া নিঃশব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, বলিল—শত্রুপক্ষের চারিজন শিবিররক্ষক ঐ স্থানে পাহারা দিতেছে। ইন্দ্রনাথ দশ জন তীরন্দাজকে অগ্রে যাইতে বলিলেন ও আদেশ করিলেন—যদি ঐ চারিজনের মধ্যে একজন পলাইয়া যাইয়া শিবিরে সংবাদ দেয়, তবে তোমাদের দশ জনের প্রাণ সংহার করিব! তীরন্দাজগণ ধীরে ধীরে যাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে চারি জনকেই ভূতলশায়ী করিল। ইন্দ্রনাথের সেনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরও দুই তিন স্থানে ঐরূপ পাহারা ছিল, রক্ষকগণ ঐরূপে নিহত হইল। অচিরে ইন্দ্রনাথ শত্রুদিগের পারিখার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সেনাদিগকে পারিখা পার হইতে আদেশ দিলেন।

পারিখার অপর পার্শ্বের মুসলমানগণ সহসা শত্রুর আগমন দেখিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা সজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রনাথ সসৈন্যে পরিখা পার হইয়া তাহা-

দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রনাথ তখন সৈন্যগণকে সেই পারিখা রক্ষা করিবার জন্য রাখিয়া কেবল পঞ্চাশ জন মাত্র সঙ্গে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে কারাগারের দিকে যাইলেন।

কারাগৃহের বাহিরে সৈনিকগণ দ্বার রক্ষা করিতেছে। ইন্দ্রনাথ এখনও কারাগৃহে বদ্ধ আছে, তাহারা এইরূপ বিবেচনা করিতেছিল; সহসা ইন্দ্রনাথের বজ্রনাদ শুনিয়া, এবং ইন্দ্রনাথ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, বেগে পলায়ন করিল। ঘরের নিকট যাইয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাঁহার ঘরের রক্ষকদ্বয় এখনও সুরায় অচেতন, নিকটে একটী দীপ জ্বলিতেছে। ইন্দ্রনাথ দীপটী হাতে লইয়া ঘরের ভিতর যাইলেন, দেখিলেন সেই অন্ধকারময় কারাগৃহের তৃণশয্যায় বিমলার শ্রান্ত শীর্ণ দেহলতা পড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষু মুদিত, নিশ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষঃস্থল ধীরে ধীরে স্ফীত হইতেছে।

ইন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত্তকাল সজল নয়নে ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ক্ষীণ দেহলতা তৃণশয্যা হইতে উঠাইয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্ষণেক পর বিমলার যেন চেতনা হইল, ইন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন—সেনাপতি ইন্দ্রনাথ আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন? ভগবান্ আপনার উপকার করিবেন। আমি মৃত্যুই স্থির করিয়াছিলাম, কেবল মৃত্যুর সময় পিতাকে দেখিলাম না, এই জন্য মনে বড় ক্লেশ হইতেছিল। সেনাপতি, আমার উদ্ধার সাধন করুন, আমি পিতাকে আর একবার দেখিব।

এই কাতর স্বর শুনিয়া ইন্দ্রনাথের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, কিন্তু উত্তর দিবার অবসর ছিল না। ইন্দ্রনাথ অশ্বারোহণ করিলেন, এবং শিশুকে যেরূপ উঠাইয়া লয়, বিমলার ক্ষীণ শরীর আপনার পশ্চাতে উঠাইয়া লইলেন। বিমলা না পড়িয়া যান এই জন্য একটা পেটী দিয়া বিমলার শরীর ইন্দ্রনাথের শরীরের সহিত বদ্ধ করা হইল।

যেখানে ইন্দ্রনাথের অশ্বারোহীগণ পারিখা রক্ষা করিতেছিল, বিদ্যুৎগতিতে ইন্দ্রনাথ সেইখানে যাইলেন। চারিদিকে কৃষ্ণমেঘের ন্যায় প্রায় তিন চারি সহস্র শত্রুসৈন্য সজ্জিত হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্রনাথ দ্রুতবেগে সসৈন্যে পারিখা পার হইয়া দ্রুতবেগে দুর্গাভিমুখে চলিলেন, শত্রুসেনা নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা মুঙ্গেরে পঁহুছিলেন।

সমস্ত শিবির জয় জয় রবে পরিপূরিত হইল। ইন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইয়াছেন, হইয়াই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার পঞ্চশত অশ্বারোহীর সহিত শত্রুদিগের পারিখা উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন, এরূপ সংবাদ পাইয়া মোগল সৈন্যগণ উল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইল। টোডরমল্ল স্নেহ-সহকারে ইন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি কিরূপে উদ্ধার পাইলেন জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অবসর রহিল না।

কয়েক জন অশ্বারোহী ভিন্ন বিমলার কথা কেহ জানিল না। বিমলা সেই রজনীযোগেই পিত্রালয়ে যাইলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

Out! Out! brief candle!

Shakespeare.

উপরি উক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রাজা টোডরমল্ল ও ইন্দ্রনাথ দুই জনে দুর্গের প্রাচীরোপরি পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতেছিল।

রাজা। ইন্দ্রনাথ! যুদ্ধে কেবল সাহস আবশ্যক করে না, রণকৌশলও আবশ্যক।

ইন্দ্রনাথ। কিন্তু আপনি কি বোধ করেন, যদি আমরা দুর্গ ছাড়িয়া সম্মুখরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা পরাস্ত হইব?

রাজা। যুদ্ধ করিলে পরাস্ত হইব না, কিন্তু কয় জন যুদ্ধ করিবে?

ইন্দ্রনাথ। মহারাজ, তবে আমরা কয় দিন এই অবস্থায় দুর্গের ভিতর থাকিব?

রাজা। আর অধিক দিন নহে; ঐ যে একখানি শিবিকা আসিতেছে, উহার আরোহী আমাদিগকে এইক্ষণেই সংবাদ দিবেন যে আর অল্প দিনের মধ্যে শত্রুর বিনাশ হইবে, আমাদের বিনা যুদ্ধে জয় হইবে!

ইন্দ্রনাথ। মহারাজ! আপনার যুদ্ধকৌশল জগৎবিখ্যাত। কিন্তু আপনি ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন, তাহা আমি জানিতাম না।

সেই শিবিকা নিকটে আসিলে তাহার ভিতর হইতে দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র অবতরণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্রের সহিত রাজা টোডরমল্লের যে যে কথা হইল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক নাই। সতীশ-চন্দ্র রাজা টোডরমল্ল কর্তৃক বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হিন্দু জমীদারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র কার্য্যদক্ষ, বাক্‌পটু ও বুদ্ধিমান। সেই সকল জমীদারের নিকট নানারূপ কারণ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে একে একে শত্রুপক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটপক্ষ অবলম্বন করিতে লওয়াইয়াছিলেন। আক্‌বর-সাহ হিন্দুদিগের পরমবন্ধু; হিন্দুদিগের উপর অন্যায় করসমূহ উঠাইয়া দিয়াছেন; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন; হিন্দুরমণী বিবাহ করিয়াছেন; হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার কোন কোন অংশে অবলম্বন করিয়াছেন; বঙ্গদেশে হিন্দু-সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন; বিজয়লক্ষ্মী স্বয়ং সে সেনাপতির ছায়াস্বরূপ; তিনি দুইবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া-ছিলেন এবং এবারও জয় করিবেন; জয় করিলে বিদ্রোহী জায়গীরদারদিগকে শাস্তি দিবেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সহায়তা

করিলে সে ক্ষত্রিয় মহাত্মা কখন সে ঋণ বিস্মৃত হইবেন না;—ইত্যাদি নানারূপ প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া, সতীশচন্দ্র অনেক জমীদারকে সম্রাট্‌পক্ষাবলম্বী করিয়াছিলেন। সেই জমীদারগণ এক্ষণে শত্রুসৈন্যদিগকে খাদ্যদ্রব্য পাঠাইবেন না স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যে শত্রুগণ আহার অভাবে রণে ভঙ্গ দিয়া ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া দিগ্বিদিক্ চলিয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা সতীশচন্দ্রকে বহু সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন, ইন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—ইন্দ্রনাথ, আমার কথা সত্য কি না?

ইন্দ্র। মহাশয়, আপনি যুদ্ধে যেরূপ অজেয়, কৌশলে সেইরূপ অতুল্য! কিন্তু—

রাজা। কিন্তু কি?

ইন্দ্র। আমি কাহারও বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু সতীশচন্দ্রের সমস্ত কথা আপনি কি বিশ্বাস করেন?

রাজা। তরুণ সেনাপতি কি টোডরমল্লকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে চাহেন? কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, কাহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা ইন্দ্রনাথ কি আমা অপেক্ষা ভাল জানেন?

ইন্দ্র। মহারাজ! আমার অপরাধ লইবেন না, কিন্তু হইতে পারে এই সতীশচন্দ্রের সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, আমি তাহা অপেক্ষা অধিক জানি।

রাজা। হইতে পারে ইন্দ্রনাথ যতদূর জানেন, আমিও তত-

দূর জানি; হইতে পারে ইন্দ্রনাথের মনে এইক্ষণে কি চিন্তা হইতেছে তাহাও আমি জানি।

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রাজার দিকে চাহিয়া রহিলেন; রাজা পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এই সতীশচন্দ্র রাজা সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ তাহাই চিন্তা করিতেছেন।

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় হইলেন, বলিলেন—মহারাজ! ক্ষমা করুন। আপনি অন্তর্য্যামী।

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—ইন্দ্রনাথ! কেবল ভগবানই অন্তর্য্যামী; কিন্তু দিল্লীশ্বরের সেনাপতি চারিদিকের সন্ধান না রাখিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। যুদ্ধকার্য্যে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যুদ্ধকৌশল কিছু শিখিয়াছি।

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ! তবে রাজা সমরসিংহের হত্যাকথা আপনি অবগত আছেন।

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—সে হত্যাকথা আমি জানি, এবং যথাকালে সে হত্যার বিচার করিব। আমার পুত্রকে হত্যা করিলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি কিন্তু রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি না।

সেইদিন রাত্রি একপ্রহরের সময়ে সতীশচন্দ্র গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছেন। আজি তিনি রাজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় উল্লাসে পরিপূরিত হইয়াছে, মায়াবিনী আশা তাঁহার কাণে কাণে বলিতেছে, "তুমি একদিন পাপের

দণ্ডের ভয় করিয়াছিলে, সে পাপ কে জানিতে পারিয়াছে? দণ্ড কোথায়? এখন দিন দিন তোমার সম্মানবৃদ্ধি হউক, পদবৃদ্ধি হউক।” সূর্য্য অস্তে যাইবার সময় অবধি কুহকিনী আশা তাঁহার কাণে কাণে এই প্রকারে বলিতেছিল, সেই সূর্য্য পুনরায় উদয় হইবার অগ্রে সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, আশা মায়াবিনী, কুহকিনী, মিথ্যাবাদিনী।

সহসা চন্দ্রালোকে সতীশচন্দ্র একজন দস্যুকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই দস্যু ছুরিকাহস্তে সতীশচন্দ্রের দিকে দৌড়াইয়া আসিল। সতীশচন্দ্র পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল, সেই হত্যাকারী ছুরিকাদ্বারা সতীশচন্দ্রকে আঘাত করিল। সতীশচন্দ্রের ভৃত্যগণ তখন দৌড়াইয়া আসিয়া খড়্গ দ্বারা দস্যুকে ভূতলশায়ী করিলেন।

মৃতপ্রায় দস্যু বলিল—সতীশচন্দ্র, আপনার মৃত্যু সন্নিকট।

সতীশচন্দ্র। নরাধম! ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তোর আঘাতে সামান্য মাত্র রক্ত পড়িয়াছে।

দস্যু। সেই সামান্য আঘাতে আপনার প্রাণনাশ হইবে, আমার ছুরিকা বিষাক্ত। প্রভু! আপনি আমাকে কি জানেন্ না।

সতীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপনার পুরাতন ভৃত্যকে চিনিলেন, বলিলেন—নরাধম! তোকে কে এরূপ প্রভুভক্তি শিখাইয়াছিল?

ভৃত্য অতি ক্ষীণ ও স্খলিতস্বরে উত্তর করিল—পাপিষ্ঠ শকুনি।

সতীশচন্দ্র তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—আমিও ভাবিয়াছিলাম সেই পামরেরই এই কার্য্য। পৃথিবীতে তাহার

মত ভীষণ পাপী আর নাই, নরকেও নাই। কিন্তু তুই আমার পুরাতন ভৃত্য হইয়া আমার বধের সঙ্কল্প করিয়াছিলি ?

ভৃত্য আরও ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল—শ—শ—শকুনি অনেক লোভ দেখাইয়াছিল, লোভে পড়িলে জ্ঞান থাকে না, লোভে পড়িয়া পাপ করিলাম, প্রাণ হারাইলাম।

আর কথা বাহির হইল না ; শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে স্থির হইল, নয়ন দুইটী আ... শের দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রালোকে মৃতদেহের দিকে চা... সতীশচন্দ্র বলিলেন—ভৃত্য, তোর অপেক্ষা জ্ঞানী লো... লোভে পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়াছে, তোর অপেক্ষা ভী... পাপ করিয়াছে, তোর মত প্রাণ হারাইবারও বিলম্ব না... পরমেশ্বর তোকে ক্ষমা করুন, আমার পাপের ক্ষমা নাই।

প্রাতঃকালে রাজার নিকট সংবাদ আসিল, দেওয়া... সতীশচন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। রাজা তৎ... সতীশচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন, ইন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তথায় যাইয়া দেখিলেন, সতীশচন্দ্র শয্যায় শয়ন করি... রহিয়াছেন, চারিদিকে চিকিৎসক বসিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ... ভীষণ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে পরিত্রাণ নাই। রাজা এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্শ্বস্থ অনুচরগণ সবিশেষ অবগত করাইল। তখন সতীশচন্দ্র অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন—মহারাজ! আমি পাপী, পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন।

রাজা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন—আমি ভীষণ দোষ করিয়াছি, সে অপরাধ ক্ষমা করুন।

রাজা তথাপি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন—মহারাজ! আমি নরহত্যাকারী; কিন্তু সকল অপরাধেরই ক্ষমা আছে; আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নরহত্যাকারী; মৃত্যুশয্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। সে কাতরস্বর শ্রবণ করিয়া রাজা আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে আমি কখনও ক্ষমা করিব ভাবি নাই। কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে শাস্তি দিয়াছেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার জীবিত থাকিবার আর অধিক কাল নাই, ভগবানের নাম গ্রহণ কর, তিনি দয়ার সাগর, মৃত্যুকালে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে জীবনের পাপ খণ্ডন হয়।

চকিত হইয়া সতীশচন্দ্র আবার রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—মহারাজ! তবে আপনি সমরসিংহের মৃত্যুর কারণ সবিশেষ অবগত আছেন?

রাজা উত্তর করিলেন—আছি।

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর আবার বলিলেন—মহারাজ! আমার একটী নিবেদন আছে। আমি পাপী বটে, কিন্তু জন্মাবধি পাপী ছিলাম না, যৌবনে আমার জীবন পবিত্র ছিল, উচ্চ মতি, উচ্চ আশয়, উচ্চ প্রবৃত্তি ছিল। লোভে, মহালোভে, পড়িয়া সে সকল হারাইয়াছি, জীবন পাপে কলুষিত হইল, আজি প্রাণ হারাইলাম—

সতীশচন্দ্রের ক্ষীণস্বর অধিকতর ক্ষীণ হইয়া আসিল, আর কথা নিঃসৃত হইল না। রাজা সস্নেহে ওষ্ঠে দুগ্ধ দিলেন, রসশূন্য

ওষ্ঠ পুনরায় সিক্ত হইল। সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন—আমি পাপী বটে, কিন্তু আমার অপেক্ষাও ঘোরতর পাপী আছে। মহারাজ! আমার ভৃত্য শকুনিই যথার্থ সমরসিংহকে বধ করিয়াছে, সেই অদ্য আমাকে বধ করিল, আপনি তাহার বিচার করিবেন।

ক্রোধে রাজা টোডরমল্লের নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—চিন্তা নাই, জগদীশ্বর পাপীর দণ্ড দিবেন।

আবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে নীরব হইয়া রহিল। সতীশচন্দ্রের আয়ু নিঃশেষিত হইয়া আসিতে লাগিল। অনেক-ক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র অধিকতর ক্ষীণ ও কাতরস্বরে বলিলেন—কন্যা, আমার স্নেহের বিমলা—সহসা বাক্‌রোধ হইল।

রাজা পুনরায় অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠে দুগ্ধ দান করিলেন। ক্ষণেক পর আবার বলিতে লাগিলেন—হতভাগিনী বিমলা, তোমার মাতা নাই, তুমি আজি পিতৃহীন হইলে!—এই কথা বলিতে বলিতে পার্শ্বের গৃহ হইতে হৃদয়বিদারক রমণীকণ্ঠ-জাত ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল, সে ধ্বনি শুনিয়া সতীশচন্দ্রের স্পন্দহীন নয়নদ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলা বেগে পিতার নিকটে আসিলেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু সে সময়ে সে জ্ঞান কোন্ রমণীর থাকে?

ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বপরিচিত রমণীকে সতীশচন্দ্রের কন্যা বিমলা বলিয়া জানিয়া বিস্মিত হইলেন!

বিমলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। বোধ হইল যেন সেই পবিত্র আলিঙ্গনে সতীশচন্দ্রের

হৃদয় উদ্বেগশূন্য হইল, মুখমণ্ডল শান্তভাব ধারণ করিল, নয়ন দুইটী চিরনিদ্রায় মুদ্রিত হইল।

তখন বিমলা বার বার সেই মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আজ বিমলার নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইল, আজি চারিদিক্ অন্ধকার হইল, আজি হৃদয় বিদীর্ণ হইল, আজি জগৎ শূন্য হইল।

সেই দৃশ্য দর্শন করিয়া রাজা নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ইন্দ্রনাথ খড়্গের উপর ভর দিয়া বালিকার ন্যায় অবারিত নয়নধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে প্রত্যাগমন।

If after every tempest come such calms,
May the winds blow till they have wakened death.

Shakespeare.

আজি পূর্ণিমা তিথি, কিন্তু আকাশ দেখিলে কে বলিবে আজি পূর্ণিমা? গভীর ধূম্রবর্ণ মেঘরাশিতে আকাশ অদ্য আচ্ছন্ন রহিয়াছে, জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-লতার ভীষণ আলোকে সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দীপ্ত হইতেছে, আবার পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকার হইতেছে। মুষলধারা বৃষ্টিতে ক্ষেত্র, গ্রাম, পথ, ঘাট সকল ভাসিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন সেই বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে। বায়ু রহিয়া রহিয়া অতিশয় শব্দ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, সেই বায়ুশব্দের মধ্যে মধ্যে মেঘের অনেকক্ষণস্থায়ী গর্জ্জন জগৎসংসার ত্রস্ত ও কম্পিত করিতেছিল।

এরূপ ভয়ঙ্কর বাত্যায় সরলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যস্থ একটী জনশূন্য. কুটীরাভ্যন্তরে একাকিনী বসিয়া আছে, কি জন্য ? বালিকার হৃদয়ে কি ভয় নাই, এই অন্ধকারে এই ভয়াবহ মেঘগর্জ্জনে বালিকার হৃদয়ে কি শঙ্কা হইতেছে না ?

না, অদ্য সরলার চিত্তে আর ভয় নাই, অদ্য সরলা কাহাকেও ভয় করে না। সুখের আশা, জীবনের আশা অদ্য শেষ হইয়াছিল, যাহার আশা নাই, তাহার ভয় কিসের ? আকাশে যে ভীষণ বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে নয়ন ঝলসিতেছিল, সরলা স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিতেছিল। তাহার পর যে ভয়ানক মেঘগর্জ্জন হইতেছিল, সরলা স্থিরচিত্তে তাহাও শ্রবণ করিতেছিল। আজি ছয় মাস হইল ইন্দ্রনাথ পশ্চিম গিয়াছেন, তিনি সরলাকে ভুলিয়াছেন, পামর শকুনি সরলার অন্য বিবাহ স্থির করিয়াছে !

একবার বাল্যাবস্থার কথা মনে আসিল। মহামান্য সমরসিংহের একমাত্র দুহিতা এই বিস্তীর্ণ উদ্যানে বেড়াইত, পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া শাখা হইতে ফুল পাড়িত, মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া এক দিন একটা পাখী ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাখী উড়িয়া গেল, নির্ব্বোধ শিশু কাঁদিল, নির্ব্বোধ শিশু জানিত না যে, জীবনের আশা ভরসা সকলই সেই পাখীর মত একে একে উড়িয়া যায় !

তাহার পর ছয় বৎসর কাল রুদ্রপুরে অতিবাহিত হইয়াছে। দরিদ্র পল্লীগ্রামে দরিদ্র কুটীরে সেই ছয় বৎসর কাটিয়াছে, কিন্তু ধন হইলেই সুখ হয় না, দারিদ্র্য হইলেই দুঃখ হয় না।

সরলার অন্তঃকরণে সেই ছয় বৎসর পরম সুখের কাল বলিয়া বোধ হইল। প্রাণের সখী অমলা! তাহাকে কি আর দেখিতে পাইবে? প্রাতঃকালে সেই অমলার সহিত প্রত্যহ ঘাটে জল আনিতে যাইত, সন্ধ্যার সময় সেই অমলার সহিত অনন্ত উপ-কথা, অনন্ত প্রণয়ের কথা হইত। সুখের সময় অমলা নিকটে থাকিলে সুখ দ্বিগুণ হইত, দুঃখের সময় অমলার প্রবোধবাক্যে দুঃখ শান্তি হইত। আজি সে অমলা কোথায়? পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছে!

তাহার পর বনগ্রামের আশ্রমবাসিনী কমলা, তিনিও সরলাকে বড় ভালবাসিতেন। আর এই দুর্গবাসিনী বিমলা, তিনিও সরলাকে কত যত্ন করিয়াছেন। তাঁহারা কোথায়? তাঁহারাও কি পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছেন?

আর সেই ইন্দ্রনাথ! যাহার চিন্তায় আজি ছয় মাস সরলার হৃদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহার আশায় আজি ছয় মাস সরলা জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? বাল্যকালে ইচ্ছামতীতীরে যাহার পার্শ্বে বসিয়া বালিকা গল্প শুনিত, গল্প শুনিত আর একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; যৌবনের প্রারম্ভে যে প্রেমময় মুখখানির কথা সদাই ভাবিত, ভাবিত আবার সেই মুখখানি দেখিয়া হৃদয় শীতল করিত, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? রুদ্র-পুরের কুটীর পার্শ্বে চন্দ্রালোকে ইন্দ্রনাথ বিদায় লইয়াছিলেন, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? হায়! তিনিও পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছেন, অনন্ত সংসারাকাশে বিচরণ করিতেছেন।

সরলা ভাবিয়া ভাবিয়া হতজ্ঞান হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল,

কিন্তু চক্ষুতে জল নাই। বালিকার হৃদয়ে আজি যে যাতনা, অশ্রুজলে তাহা নিবারিত হয় না। যতদিন জীবনে একটী আশা থাকে, ততদিন জীবন সহনীয় হয়, কিন্তু সরলার পক্ষে এক একটী করিয়া সকল আশাই তিরোহিত হইয়াছিল, পৃথিবী শূন্য হইয়াছিল, সংসার তমোময় হইয়াছিল। এক একটী করিয়া নাট্যশালার দীপ নির্ব্বাণ হইল, সরলা ধীরে ধীরে সেই নাট্যশালা ত্যাগ করিবার আশায় বসিয়া আছে।

কিন্তু আমাদের সুখ সম্পদের মধ্যে অনেক সময়ে বিপদ আইসে, আবার নৈরাশ্যের মধ্যে ও আশার সঞ্চার হয়। সরলার বোধ হইল যেন একটা শব্দ হইল। সরলা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চারিদিক দেখিল, কিন্তু সে নিবিড় অন্ধকারে কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। অন্য দিন হইলে, সরলা ভীত হইত, কিন্তু আজি বালিকার হৃদয়ে ভয় নাই।

এমত সময়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোক দেখা দিল। সে আলোকে সরলা সম্মুখে কি দেখিতে পাইল? সরলার সম্মুখে, কেবলমাত্র দশ হস্ত দূরে, একটী মনুষ্যের আকৃতি! দীর্ঘ আকৃতি, দীর্ঘ বাহু, উন্নত ললাটের উপর যোদ্ধার উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে, কটিদেশে যোদ্ধার অসি লম্ববান্ রহিয়াছে! সে আকৃতি, সে বদনমণ্ডল, সে উজ্জ্বল নয়নদ্বয় সরলার অপরিচিত নহে! মুহূর্ত্ত মধ্যে সরলার পতনোন্মুখ কম্পিত দেহখানি সেনাপতি ইন্দ্রনাথ হৃদয়ে ধারণ করিলেন!

প্রাতঃকালে ইন্দ্রনাথ আপন নৌকা হইতে কয়েক জন সৈনিক পুরুষকে ডাকাইলেন। পরে রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞানুসারে শকুনিকে বন্দী করিয়া লইয়া ইচ্ছাপুরাভিমুখে

যাইতে লাগিলেন। রাজা স্বয়ং অচিরে ইচ্ছাপুরে সুরেন্দ্রনাথের ভদ্রাসনে আসিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও বিমলা এক নৌকায় যাত্রা করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় ইচ্ছাপুরে পঁহুছিয়া ইন্দ্রনাথ পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিলেন।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ইচ্ছাপুরে প্রত্যাগমন।

WHEN wild war's deadly blast was blown,
And gentle peace returning.
With many a sweet babe fatherless,
And many a widow mourning,
I left the lines and tented field,
Where long I'd been a lodger.

Burns.

বহুকালের পর আত্মীয় স্বজনের পরস্পর মিলনে যে অপর্য্যাপ্ত সুখলাভ করিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নগেন্দ্রনাথ বহুকাল পরে পুত্রকে পাইয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পুত্রকে বার বার আলিঙ্গন করিয়া সহস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

বনগ্রাম হইতে চন্দ্রশেখর কমলাকে সঙ্গে করিয়া ইচ্ছাপুরে আসিলেন। রুদ্রপুর হইতে অমলা স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা টোডরমল্ল আসিবেন শুনিয়া সকলেই সকল দিক্ হইতে ইচ্ছাপুরে আসিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ যে জমীদার নগেন্দ্রনাথের পুত্র তাহা সকলেই জানিতে পারিল। সরলা একদিন গোপনে ইন্দ্রনাথকে কহিল—আমি তোমাকে দরিদ্র ভদ্রসন্তান জানিয়া কথা কহিতাম, জমীদারপুত্র জানিলে ভয়ে কথা কহিতাম না।

ইন্দ্রনাথ সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন—সেজন্য এখন যেন পুরাতন ভালবাসা ভুলিও না।

সরলা মনে মনে ভাবিল—পারিব কেন? লজ্জাবনতমুখী বেগে পলায়ন করিল।

অমলা রুদ্রপুরে ইন্দ্রনাথকে সামান্য কায়স্থপুত্র বলিয়া কত তামাসা করিত, এক্ষণে তাঁহাকে জমীদারপুত্র জানিয়া লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু ইন্দ্রনাথ অল্পে ছাড়িবার লোক নহেন। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নবীনদাসের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অমলা তাঁহাকে দেখিয়া দেড় হাত ঘোমটা টানিল!

ইন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—বটে, এই বুঝি পুরাতন ভালবাসা?

অমলা লজ্জিত হইল, অথচ তামাসা ছাড়িল না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল—আপনি পরের বাড়ীর ভিতর গিয়া এইরূপ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেন, আমি সরলাকে বলিয়া দিব।

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—অমলা, তুমি আমাকে পর মনে কর, আমি তোমাকে পর মনে করি না।

অমলা এবার অপ্রতিভ হইল। অবগুণ্ঠন খুলিয়া বলিল—আমায় ক্ষমা কর, আর আমি তোমার নিকট লজ্জা করিব না। সেই অবধি অমলার লজ্জা ভঙ্গ হইল।

মহাশ্বেতা যে রাজা সমরসিংহের বিধবা, তাহা জানিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল। এখন আর মহাশ্বেতা দরিদ্রা নহেন, রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞানুসারে সমরসিংহের বিস্তীর্ণ অধিকার তাঁহার বিধবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সকলের সুখ দেখিয়া বিমলাও আপনার দুঃখ কিয়দংশ বিস্মৃত হইলেন। সরলার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ হইয়াছিল; সরলা আজি পিতার বিস্তীর্ণ জমীদারীর উত্তরাধিকারিণী, পাপাত্মা শকুনি এক্ষণে বন্দী, এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়া বিমলা মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চিন্তাশীলা কমলাও তাঁহাদিগের সহিত থাকিতেন। তিনি এক্ষণে নগেন্দ্রনাথের গৃহে বাস করেন, এবং প্রত্যহ নিজহস্তে পাক করিয়া নগেন্দ্রনাথকে খাওয়ান। নগেন্দ্রনাথ কমলার কন্যাতুল্য যত্নে প্রীত হইলেন।

ইচ্ছাপুরে আনন্দের উৎস বহিতে লাগিল; রাজা টোডরমল্ল আসিবেন বলিয়া বড় ধূমধাম ও আয়োজন হইতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

জমীদারের পুত্র ও পুত্রবধূ।

SHE gazed—she reddened like a rose,
  Syne pale like ony lily ;
She sank within my arms and cried,
  "Art thou my ain dear Willie ?'
"By Him who made yon sun and sky,
  By whom true love's regarded,
I am the man ; and thus may still
  True lovers be rewarded."

Burns.

সন্ধ্যাকাল আগত। কমলা একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছাপুরের নিকটস্থ যমুনা নদীর তীরে যাইয়া পড়িলেন। একাকী যমুনার তীরে বসিয়া স্বভাবের নিস্তব্ধ ভাব অবলোকন করিতেছিলেন, ঘন বৃক্ষাবলির মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা খেলা করিতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। নীল আকাশে দুই একটী শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, শান্ত নদীর উপর অনেকগুলি

নৌকা ভাসিতেছে। রাজা টোডরমল্লের ইচ্ছাপুর আগমন উপলক্ষে অনেক দেশের লোক তথায় আসিতেছে।

কমলা সততই চিন্তাশীল, কিন্তু অদ্য যেন কোন বিশেষ চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। সেই নদীতীরে বসিয়া শান্ত নয়ন দুইটী ফিরাইয়া আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তারার শান্ত জ্যোতিঃ সেই শান্ত নয়ন ও মুখমণ্ডলের উপর পড়িতেছে। আলুলায়িত কেশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, বা বদনমণ্ডল ঈষৎ আবৃত করিয়া বক্ষঃস্থলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুর উপর বদনমণ্ডল স্থাপিত রহিয়াছে। কমলা কি চিন্তা করিতেছেন?

কমলা আজি পূর্ব্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্বামীর মৃত্যুর কথা তাঁহার স্মরণ হইতেছে; স্বামীর দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে; স্বামীর প্রণয়ে হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছে! বোধ হইতেছে যেন সন্ধ্যার বায়ুর সহিত তাঁহার স্বামীর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত বহিয়া যাইতেছে। সঙ্গীতশব্দে চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, নদীর উপর দেবাকৃতি একজন মনুষ্য একখানি তরী চালন করিতেছেন, এবং আকাশের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে গীত গাইতেছেন।

কমলা বার বার সেই দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সহস্র চিন্তা জাগরিত হইতে লাগিল। আবার নৌকারোহী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। আবার সে সঙ্গীতে কমলার হৃদয় উদ্বেলিত করিল। এক দণ্ড ধরিয়া কমলা সে গান শুনিতে লাগিলেন। যৌবনে কমলা সে গান শুনিয়াছিলেন; গানের কথায় কথায় মাধুরীত্ব ক্ষরিতেছে; গানের

অক্ষরে অক্ষরে পূর্ব্বস্মৃতি গ্রথিত রহিয়াছে! এ কি স্বপ্ন, না সত্য, না পূর্ব্বস্মৃতি মাত্র?

আকাশে চাঁদ উঠিল। সেই নীল আকাশ, সেই অনন্ত বৃক্ষাবলি, সেই নদী, আলোক পরিপূর্ণ করিয়া চন্দ্র উদিত হইল। নৌকাখানি ভাসিতে ভাসিতে নিকটে আসিল, কমলা সেই চন্দ্রালোকে নৌকারোহীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা নারী পতির কণ্ঠস্বর বিস্মৃত হয় না, পতির দেবমূর্ত্তি বিস্মৃত হয় না! বাতাহত পত্রের ন্যায় কমলার দেহলতা কাঁপিতে লাগিল। অচিরে মূর্চ্ছিতা হইয়া কমলা ভূমিতলে পতিত হইলেন।

ক্ষণেক পর কমলা চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন, সেই যৌবনের হৃদয়েশ্বর তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সযত্নে ললাটে জল সিঞ্চন করিতেছেন, সস্নেহে সেই কম্পিত ওষ্ঠ চুম্বন করিতেছেন। চিরহতভাগিনী কমলা এই সৌভাগ্যের স্পর্শে শিহরিয়া উঠিলেন, পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন—ভগবান্! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখ নিদ্রা হইতে জাগরিত না হই।

সেই চন্দ্রালোকে, সেই জনশূন্য নদী-তীরে, সেই নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বে, উপেন্দ্রনাথ অনিমেষ লোচনে সেই বহুপূর্ব্বদৃষ্ট বদনমণ্ডলের দিকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুন্দর ললাট, সেই নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল, সেই স্নেহপরিপূর্ণ চিন্তাপ্রকাশক নয়ন, সেই মধুর ওষ্ঠ, ও সেই নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই উন্নত হৃদয় ও সুসৌষ্ঠব বাহুযুগল। উপেন্দ্র দেখিতে দেখিতে পাগলের ন্যায় হইয়া সেই হৃদয়ের প্রতিমাকে

চুম্বন করিতে লাগিলেন। জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী কমলা দেব-তুল্য পতিকে পাইলেন, তাঁহার পুলকিত শরীর স্বামীর আলি-ঙ্গনে বদ্ধ, স্বামীর ওষ্ঠে তাঁহার ওষ্ঠ, স্বামীর হৃদয়ে তাঁহার হৃদয়!

অনেকক্ষণ পরে উপেন্দ্র বলিলেন—নিকুঞ্জবাসিনী কমলা! আমার নৌকা মগ্ন হইবার পর আমি পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে আর পাইব, আমার আশা ছিল না। গ্রামে ফিরিয়া আসিলে গ্রামের লোকে আমাকে বলিয়াছিল, পীড়ায় তোমার কাল হইয়াছে।

কমলা বলিলেন—হৃদয়েশ্বর! তোমার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমার সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে নিস্তার পাইয়াছিলাম। যখন নিস্তার পাইলাম তখন আমি বনগ্রামের আশ্রমে।

উপেন্দ্র। জগদীশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ কর। এক্ষণে আইস, তোমাকে তোমার শ্বশুরালয়ে লইয়া যাই।

কমলা। আমার শ্বশুরালয় কোথায়?

উপেন্দ্রনাথ কমলাকে লইয়া জমীদার নগেন্দ্রনাথের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত কথা যখন প্রকাশিত হইল তখন জমীদার গৃহে যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। জমীদারের জ্যেষ্ঠপুত্রের বহুদিন পূর্ব্বে কাল হইয়াছে বলিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিল; সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র আজি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ গৃহ আলো করিলেন, এ সকল কথা জমীদার গৃহ হইতে সমস্ত গ্রামে, গ্রাম হইতে সমস্ত দেশে প্রচার হইল। ইচ্ছাপুরনগর জয়-

ঢাকের নাদে পরিপূর্ণ হইল, প্রাসাদ ও পর্ণকুটীর পতাকায় শোভিত হইল, দিবানিশি লোকের আনন্দ শব্দে শব্দিত হইল।

বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথ বার বার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কন্যাতুল্যা কমলাকে পুত্রবধূ জানিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পথে, ঘাটে, গৃহে, কুটীরে, শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, আনন্দের ঢাক বাজিতে লাগিল, পুরবাসিগণ উপেন্দ্রনাথের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত পুরজন ও পুরনারীদিগের আনন্দলহরী বহিতে লাগিল!

প্রাতঃকালে সুরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন—ভ্রাতঃ! আপনার অজ্ঞাতবাসে আমি আপনার প্রতি মুঙ্গেরে কত অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবেন, আমি জানিতাম না, ভ্রমবশতঃ করিয়াছি।

উপেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—সুরেন্দ্রনাথ! তোমার ক্ষমা চাহিবার আবশ্যক নাই, জগৎসংসারে তোমার মত ভ্রাতা দুর্লভ। তোমার সাহস, বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের যশে বঙ্গদেশ যেরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে, তোমার দয়া, প্রজাবাৎসল্য ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্গুণেও আমাদের দেশে সেইরূপ পরিপূর্ণ ও আনন্দিত হইয়াছে। যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা ও ধন থাকে, তাঁহারা সকলেই যদি তোমার মত অমায়িক হইত, তাহা হইলে এ জগৎসংসার স্বর্গ হইত।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

BEHOLD where stands
The usurper's cursed head.

Shakespeare.

রাজা টোডরমল্ল ইচ্ছাপুরে আসিয়াছেন, আজি আনন্দে ইচ্ছাপুরবাসিগণ মত্ত হইয়াছে।

বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রাজার সভা হইয়াছে, উপরে অতি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ লম্বিত রহিয়াছে, সেই পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ জরীতে ঝল্‌মল্ করিতেছে। চন্দ্রাতপ হইতে সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ভূমিতে লম্বিত রহিয়াছে, শুভ্র, রক্তবর্ণ, নীল, পীত, প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্পে সেই চন্দ্রাতপ অধিকতর শোভিত হইয়াছে। চন্দ্রাতপের নীচে বিস্তীর্ণ শয্যা রচিত হইয়াছে, সে শয্যা পারস্য

দেশীয় গালিচায় মণ্ডিত, স্থানে স্থানে সুন্দর পুষ্প, সুন্দর লতা ও অপরূপ পত্র চিত্রিত রহিয়াছে, এত সুন্দর যে সহসা সেই পুষ্পলতার উপর পদবিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ হয়। সভার মধ্য-স্থলে একটী দ্বিরদ-রদ ও রৌপ্যনির্ম্মিত এবং সুবর্ণে অলঙ্কৃত সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার চারিপার্শ্বে যোদ্ধা ও জমীদারগণ সমবেত রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে স্তূপাকারে সুগন্ধ পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ভৃত্যগণ বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া চামর ব্যজন করিতেছে। জমীদার ও যোদ্ধাগণ সকলেই সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বহুমূল্য বস্ত্রে শোভা পাইতে-ছিলেন।

সভার তিনদিকে পদাতিকগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহিগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রস্তরপুত্তলীর ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে আবার মাতঙ্গশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইরূপে তিনদিক্ সৈন্য সামন্তে বেষ্টিত। সম্মুখে রাজার আসিবার জন্য প্রশস্ত ও অতি দীর্ঘ একটা পথ, সে পথ রক্তবর্ণ মক্‌মল দিয়া মণ্ডিত, তাহার দুইপার্শ্বে আবার সৈন্যগণ সেই-রূপে সন্নিবেশিত। নিকটে ধ্বজবহ পদাতিক পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী কৃপাণপাণি হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তরুণ-অরুণকিরণে সেই নিষ্কোষিত খড়্গ ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল, প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে সেই উচ্চ পতাকা সকল পতপত শব্দে উড্ডীন হইতে লাগিল। শত যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয়পতাকা উড্ডীন্ হইয়াছিল, আজি ইচ্ছাপুরে সেই জয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে দেখিয়া নিবাসিগণ

আনন্দে নিমগ্ন হইতে লাগিল, যোদ্ধাগণের হৃদয় সাহস ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

সূর্য্যোদয় হইবার পরই রাজা টোডরমল্ল সভায় শুভাগমন করিলেন, তদ্দর্শনে সভাসদ্ সকলেই একবাক্যে "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া উঠিল। তাহারা নিস্তব্ধ হইলে সৈন্যগণ ক্রমান্বয়ে সেই জয়স্তুতি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে জয়নাদ চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, বোধ হইল যেন দিগন্তব্যাপী মেঘগর্জ্জন গিরিগুহায় বার বার প্রতিধ্বনিত হইল।

রাজা ধীরে ধীরে সভার দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে নগেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ, অপর পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ। পশ্চাতে আর কতিপয় খ্যাতিসম্পন্ন জমীদার ও সৈনিক পুরুষ ধীরে ধীরে যাইতেছেন। রাজা ধীরে ধীরে যাইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন।

তখন একবারে শত জয়ঢাক হইতে রণবাদ্য আরম্ভ হইল; সে সুশ্রাব্য গম্ভীর দিগন্তব্যাপী রণবাদ্য গ্রামে গ্রামে শ্রুত হইতে লাগিল, নির্ম্মল প্রাতঃকালের নীল গগনমণ্ডলে উত্থিত হইতে লাগিল। সে শব্দ শুনিয়া সৈনিকদিগের রণক্ষেত্রের কথা মনে পড়িল, একেবারে সহস্র অসি কোষ হইতে ঝঞ্ঝনা শব্দে বহির্গত হইয়া রবিকিরণে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।

সে বাদ্য নিস্তব্ধ হইল, তাহার পর কতরূপ দর্শন ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইল। আজি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি ও প্রতিনিধি বঙ্গদেশ জয় করিয়া ইন্দ্রপুরে উপস্থিত হইয়াছেন, আজি একজন হিন্দু সেনাপতি বঙ্গদেশে শাসন করিতে আসিয়াছেন,

সুতরাং বঙ্গদেশের মধ্যে যে স্থানে যে কোন আশ্চর্য্য বস্তু ছিল, তাহা রাজার সম্মুখে প্রদর্শিত হইবার জন্য সমানীত হইয়াছিল। দূরদেশ হইতে খ্যাতিসম্পন্ন নিপুণ বাদ্যকর আপনার বাদ্য শুনাইয়া রাজা ও সভাসদগণকে সন্তুষ্ট করিল, দেশ বিদেশ হইতে সুন্দর গায়কগণ সুললিত গীতধ্বনিতে সকলের মন মুগ্ধ করিল, নর্ত্তকীগণ আপন অতুল্য রূপরাশি বিস্তার করিয়া সুললিত স্বরে গীত গাইয়া সকলের হৃদয় অপহরণ করিল, ঐন্দ্রজালিকগণ বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইয়া, যোদ্ধাগণ অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করিয়া, ধানুষ্কগণ বিস্ময়কর তীর বিক্ষেপ করিয়া, সভাসদগণকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

অবশেষে কবি ও কথকদিগের কথকতা আরম্ভ হইল। বঙ্গদেশে তৎকালে যাঁহারা কবিত্ব শক্তিতে বা কথকতায় পারদর্শী ছিলেন, সকলেই রাজার নিকট আপনাপন গুণের পরিচয় দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। একে একে সকলেই আপনাপন নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। কেহ বা যুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, কেহ বা দেবদেবীর স্তুতি পাঠ করিয়া সকলের মন ভক্তি পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেহ বা প্রেমের কথা আনিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন, আবার কেহ দুঃখের কথা বলিয়া সভাসদগণের চক্ষু জলে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। কবিতার মোহিনী শক্তিতে যোদ্ধার হৃদয়ও গলিতে লাগিল, যোদ্ধার নয়নেও জল আসিল।

পরে রাজা আদেশ দিলেন—আর আমোদপ্রমোদে আব-

শুক নাই, এখনও আমাদিগের প্রধান কার্য্য বাকী আছে, বন্দীকে লইয়া আইস।

চারি জন সৈনিক পুরুষ শকুনিকে লইয়া আসিল। তখন সুরেন্দ্রনাথ সম্মুখীন হইয়া বজ্রনাদে নিবেদন করিলেন—মহারাজ, আমি মহাত্মা সমরসিংহের নিরাশ্রয় বিধবা ও অনাথা কন্যার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরাধম রাজা সমরসিংহের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করাইয়াছিল। আমি দেওয়ান সতীশচন্দ্রের অনাথা কন্যার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরাধম সতীশচন্দ্রকে হত্যা করাইয়াছে।

শকুনির দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না। শকুনি যে কাগজ জাল করিয়াছিলেন, তাহা রাজার হস্তেই ছিল। তাহা বার বার পাঠ করিয়া দেখিলেন, সেই পত্র সকল সমরসিংহের দ্বারা পাঠান সেনাপতিদিগকে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অভিযোগে সমরসিংহের প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু সে সকল পত্রে শকুনির হস্তাক্ষর, আর সমরসিংহের মোহর; সেই মোহরের প্রতিকৃতি একটী শকুনির নিজ কক্ষে পাওয়া গিয়াছে।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল মহাশ্বেতা যেরূপে ছিলেন, শকুনির শত শত চর যেরূপে মহাশ্বেতাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাড়না করিয়াছিল, যেরূপে মহাশ্বেতা কন্যার সহিত পরিশেষে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে রুদ্ধ হয়েন, কোন বিষয়েই প্রমাণের অভাব ছিল না। আর সতীশচন্দ্রের হত্যার কথা রাজা আপনিই জানিতেন।

তখন রাজা টোডরমল্ল সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—

পামর! তোর জীবন পাপরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখনও জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, পরকালে ভাল হইতে পারে, ইহকালে তোর পাপের ক্ষমা নাই।

শকুনি ধীরে ধীরে বলিল—মহারাজ! আপনি আমার শত্রুদিগের কথা শুনিয়াছেন, আমার একটী নিবেদন আছে।

রাজা বলিলেন—শীঘ্র নিবেদন কর, তোর আর অধিক পরমায়ু নাই।

শকুনি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিল—আমার দোষ যদি প্রমাণ হইয়া থাকে, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ অবধ্য! আপনি হিন্দুধর্ম্মের পরম ভক্ত, হিন্দুশাস্ত্রে বিশারদ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অবধ্য! শত সহস্র দোষ করিলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য। আমি নিরাশ্রয় বন্দী, যে দিকে নিরীক্ষণ করি সেই দিকেই আমার শত্রু। সুতরাং আপনার আজ্ঞা বাধা দিবার কেহ নাই, আমাকে সহায়তা করিবার কেহ নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলে বধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন! প্রায় চারি শত বৎসর হইতে মুসলমান বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে, তাহারা অপকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও ম্লেচ্ছ, তথাপি তাহাদের মধ্যেও, বোধ হয়, কেহ ব্রাহ্মণকে বধ করে নাই। আজি ঈশ্বরেচ্ছায় এক জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা, ব্রাহ্মণ বধ করা, কি তাঁহার শাসনের প্রথম কার্য্য হইবে? মহারাজ! আজি আপনি যে পুণ্যকর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার যশ থাকিবে, আজি আপনি যে পাপকর্ম্ম

করিবেন, চিরকাল তাহার অপযশ থাকিবে। আমি নিরাশ্রয় বন্দী, আমাকে বধ করা মুহূর্ত্তের কার্য্য, কিন্তু রাজা টোডরমল্লের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক যশোরাশির মধ্যে সে কর্ম্ম কলঙ্কের স্বরূপ হইবে, রাজা টোডরমল্লের জীবনচরিত হইতে সে দুরপনেয় কলঙ্ক শত শতাব্দীতেও বিলীন হইবে না। সমস্ত ভারতক্ষেত্রে সে কলঙ্ক রটিবে; আমাদের নিকট হইলে আমাদিগের পুত্রেরা, তাহাদিগের পর আমাদিগের পৌত্রেরা, এ কথা স্মরণ করিয়া রাখিবে। সহস্র বৎসর পরেও বালকগণ পুরাবৃত্তে পাঠ করিবে যে, রাজা টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আগমনের পর প্রথমেই এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছিলেন; সহস্র বৎসর পরেও বৃদ্ধেরা গল্প করিবে যে, মুসলমানদিগের সময়েও যাহা হয় নাই, রাজা টোডরমল্লের শাসন কালে তাহা হইয়াছিল—ব্রহ্মহত্যা হইয়াছিল। মহারাজ! আমাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু দেশ দেশান্তরে, যুগ যুগান্তরে আপনার এ কলঙ্ক অপনীত হইবে না, ব্রহ্মহত্যা-রূপ মহাপাপে আপনার বিস্তীর্ণ যশোরাশি মলিন হইয়া যাইবে।

শকুনি নিস্তব্ধ হইল। তাহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তাশীল হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। সমস্ত সভা নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ!

সাদীক খাঁ বলিলেন—মহারাজ! আপনি সেনাপতি, সেনাপতির ধর্ম্ম ভুলিবেন না। আপনি শাসনকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তার ধর্ম্ম ভুলিবেন না। দোষীকে দণ্ডবিধান করুন।

রাজা উত্তর দিলেন না।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—এই বিধবা ও অনাথার আপনি

ভিন্ন আর কেহ নাই, ইহাদের বিচার করুন, দোষীকে দণ্ড দিন্। দেওয়ান সতীশচন্দ্র মৃত্যুকালে আপনার নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আপনি তাহার হত্যার বিচার করুন।

রাজা উত্তর দিলেন না।

সভাসদ্‌গণ বলিল—মহারাজ! আপনি শিষ্টের পালন করিবেন, দুষ্টের দমন করিবেন, আপনি শাস্তি না দিলে এই মহাপাপীকে কে দণ্ড দিবে?

রাজা উত্তর দিলেন না।

ইতিমধ্যে সেই সভার কিছু দূরে একটা অতিশয় গোলমাল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে একজন দীর্ঘকায়, শীর্ণকলেবর, কৃষ্ণবর্ণ, মলিনবেশ স্ত্রীলোক সেই সভার নিকট দৌড়াইয়া আসিল। চাৎকার শব্দ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী

শকুনি এতক্ষণ স্থিরভাবে ছিল, কিন্তু পাগলিনীকে দেখিয়া একেবারে কম্পিতকলেবর হইল। পাগলিনী দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল--

মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন! পামর আমার মাতাকে বধ করিয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার মাতার বিকট মুখ এখনও দেখিতে পাইতেছি, আমি তাহার বিচার প্রার্থনা করি।

সকলে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করায় পাগলিনী রহিয়া রহিয়া আত্মবিবরণ দিতে লাগিল।

পাগলিনী গোপকন্যা, তাহার মাতা গ্রামের মধ্যে সুন্দরী

ছিল, সুন্দরী গোপ-বিধবাকে দেখিয়া একজন ব্রাহ্মণ মোহিত হয়েন। তাহার ঔরসে সেই গোপস্ত্রীর গর্ভে শকুনির জন্ম হয়।

শকুনির পিতা যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন সে গোপ-বনিতা ও তাহার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। পরে তাহার মৃত্যুর পর শকুনি অল্প বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়। সকলে তাহাকে জারজ বলাতে শকুনি অল্প বয়সে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইল। মাতার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিত ও প্রহার করিত, সে বিধবা অচিরে শরীরের ও মনের ক্লেশে পীড়িত হইল, সেই পীড়ায় প্রাণ হারাইল। বিশ্বেশ্বরী পলাইল, মাতার মৃত্যু হইতে পাগলিনী হইল। শকুনি এই মহাপাতকের পর দেশত্যাগ করিয়া সতীশচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিল।

বিশ্বেশ্বরী প্রাণভয়ে অনেকদিন অবধি দেশদেশান্তরে লুকাইয়া বেড়াইত। অবশেষে যে দিন বনগ্রাম হইতে মহাশ্বেতা ও সরলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে বন্দীরূপে নীত হয়েন, সেই দিন বিশ্বেশ্বরীও বন্দীরূপে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে নীত হয়। পাছে বিশ্বেশ্বরী শকুনির জন্মের কলঙ্কের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে, সেই জন্য তাহাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে এতদিন বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এক্ষণে শকুনি বন্দী হইলে পর বিশ্বেশ্বরী সেই কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কারাবাসে তাহাকে যে কষ্টে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীরে কেবল অস্থিচর্ম্ম

অবশিষ্ট ছিল। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া সভাসদ্‌গণ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

শকুনি দেখিল আর পরিত্রাণ নাই। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, প্রস্তুত-মতি শকুনি তখন নির্ভয়ে শেষ উপায় অবলম্বন করিল। ধীরে ধীরে বস্ত্রে লুক্কাইত ছুরিকা বাহির করিয়া সমস্ত সভার সমক্ষে আপনাকে আঘাত করিল! ছিন্ন তরুর ন্যায় শকুনির মৃতদেহ ভূতলে পতিত হইল।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

অঙ্গুরীয় প্রতিদান।

Why let the stricken deer go weep
The hart ungalled play,
While some must watch, while some must sleep;
Thus runs the world away.

Shakespeare.

উপরি উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজা তোডরমল্ল ইচ্ছাপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রতিগমন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ পুত্রদিগকে জমীদারীর ভার দিতে ইচ্ছা করিলেন, পিতার অনুরোধে উপেন্দ্রনাথ ইচ্ছাপুরের জমীদারীর ভার লইলেন, সুরেন্দ্রনাথ চতুর্ব্বেষ্টিত জমীদারীর ভার লইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বের মত প্রজাবাৎসল্য, পূর্ব্বের মত অমায়িকতা এখনও রহিল। এখনও

ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা জানিতেন, সাধ্যমতে সে অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে যত্নবান্ হইতেন।

সুরেন্দ্রনাথ পুরাতন বন্ধু নবীনদাসকে আপনার দেওয়ান করিলেন; রুদ্রপুরে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী অমলার হাত দেখিয়া যাহা বলিয়া দিয়াছিল, তাহা যথার্থ হইল, অমলা দেওয়ানের গৃহিণী হইলেন। অমলা সরলাকে সেইরূপ ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন, তাঁহার পুরাতন বন্ধু ইন্দ্রনাথের সহিত সেইরূপ আমোদ-রহস্য করিতেন।

আমাদের ইচ্ছা এই স্থানে আখ্যায়িকা শেষ করি, কিন্তু জগতে সকলের কপালে সুখ ঘটে না, কাহারও কপালে সুখ থাকে, কাহারও কপালে দুঃখ থাকে, দুই একটী দুঃখের কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

পাঠক মহাশয় জানেন, শত্রুজিঘাংসাই মহাশ্বেতার জীবনের গ্রন্থিস্বরূপ হইয়াছিল। বৃদ্ধাবস্থায় যে চিন্তায় ছয় বৎসর কাল অভিভূত ছিলেন, সেই চিন্তা তাঁহার জীবনের প্রতিকৃতিস্বরূপ, জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে চিন্তা শেষ হইল, জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইল, সরলার বিবাহের কয়েকদিন পর কোন রোগ কি পীড়া বিনা মহাশ্বেতা কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আর বিমলা! উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা, রূপলাবণ্যসম্পন্না বিমলার কি হইল? যে দিন বিমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই দিন তাঁহার হৃদয় শূন্য হইয়াছিল, সেই দিন অবধি বিমলার পক্ষে জগৎ সংসার অন্ধকারময় হইয়াছিল। সেই দিন অবধি বিমলার কোন আশা ছিল না, কোন ভরসা ছিল

না, কোন সুখের অভিলাষ ছিল না, কোন দুঃখের ভয় ছিল না। মানবজাতি যে মায়াজালে জড়িত হইয়া জগতে সুখ দুঃখ অনুভব করে, বিমলার সে মায়াজাল ছিন্ন হইয়াছিল!

প্রিয় সখী সরলার বিবাহের পর বিমলা বনগ্রামের মহেশ্বর মন্দিরে চলিয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া থাকিতে অনেক অনুরোধ করিলেন; সরলা প্রিয় সখীর হাত ধরিয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিল; কিন্তু বিমলা সহাস্য বদনে কহিলেন—সংসারে আমার লীলা খেলা সাঙ্গ হইয়াছে, আমাকে ছাড়িয়া দাও। অগত্যা সুরেন্দ্রনাথ ও সরলা বিমলাকে বিদায় দিলেন।

বিমলা বনগ্রামের মহেশ্বর মন্দিরে চলিয়া গেলেন। শরীরে হরিদ্রবাস ধারণ করিলেন, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিলেন, দিবারাত্রি মহেশ্বরের স্তব করিতেন, এবং গ্রামের দরিদ্র দুঃখিনীদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া পুণ্যজীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রশেখর এই পুণ্যবতী তাপসীকে মা বলিয়া ডাকিতেন, আশ্রমের সকলে তাঁহার মায়া, বাৎসল্য ও পরোপকারিতা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও পূজা করিতে লাগিল। আশ্রমবাসিনী বিমলার পুণ্যজীবন পবিত্র সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কয়েক মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। তৎপরে সরলা একদিন বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহেশ্বরমন্দিরে আসিল, পিতা চন্দ্রশেখরের নিকট আসিয়া প্রণিপাত করিল।

যোগিনীবেশধারিণী বিমলার হাত ধরিয়া স্নেহময়ী সরলা

ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল ত্যাগ করিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া বলিল—দিদি, আমার কষ্টের দিন, বিপদের দিন, তুমিই আমার প্রতি স্নেহ করিয়াছিলে, আজ কি আমি তোমার জন্য কিছু করিতে পারি না?

শান্তনয়না শান্তবদনা বিমলা সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন—সরলা, তুমি স্নেহময়ী, তোমার মায়ার শরীর, কিন্তু আমার এখন কি প্রয়োজন বল? এই শান্ত আশ্রম অপেক্ষা জগতে কোথায় সুখকর স্থান আছে? পিতা চন্দ্রশেখর অপেক্ষা স্নেহপরায়ণ স্বজন কোথায় পাইব? দুঃখের সময়, চিন্তার সময়, স্বয়ং দেব দেব মহেশ্বর আমাকে শান্তনা করেন, তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিনী হইলে আমি এ জগতে ক্লেশ পাইব না, পরন্তু শান্তি লাভ করিব।

দুই সখীতে অনেক প্রকার কথা বার্ত্তা দ্বারা সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। আশ্রমের মধ্যে যে যে স্থানে সরলা পূর্ব্বে পদচারণ করিতে ভাল বাসিত, সেই সেই স্থানে প্রিয় সখী বিমলাকে সঙ্গে লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় সরলা বিমলার নিকট বিদায় লইয়া শিবিকা আরোহণ করিল। বিমলা সখীর সঙ্গে সঙ্গে শিবিকা পর্য্যন্ত আসিয়া হাসিয়া বলিল—সরলা, এখন তুমি রাজরাণী, এখন কি দরিদ্র আশ্রমবাসিনীকে মনে থাকিবে?

সরলা। দিদি তোমাকে কি আমি ভুলিতে পারি?

বিমলা। সরলা, তোমার স্নেহের শরীর, তুমি আমাকে কখনও ভুলিবে না তাহা জানি। তথাপি একটী স্মরণচিহ্ন তোমার নিকট রাখিব, তাহাতে না বলিও না।

এই বলিয়া বিমলা কণ্ঠমালা হইতে ধীরে ধীরে একটী স্বর্ণের অঙ্গুরীয় খসাইয়া সরলার আঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন। সরলা বিস্মিত হইয়া বলিল—একি দিদি? এ যে স্বর্ণের অঙ্গু-রীয়! এ আমি লইব না। তোমার পৈতৃক সম্পত্তির অবশিষ্ট দুই এক খানি গহনা যাহা আছে তাহা কি আমি লইতে পারি? সে সমস্ত তোমারই নিকট শোভা পায়।

বিমলা একটু হাসিয়া বলিলেন—সরলা, এ অঙ্গুরীয় আমার পৈতৃক সম্পত্তি নহে, ইহাতে আমার অধিকার নাই। তুমি ইহার অধিকারিণী, আজীবন এই অঙ্গুরীয় ধারণ করিও, জগ-দীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।

সন্ধ্যার ছায়াতে ধীরে ধীরে বিমলা আপন কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ENGLISH WORKS

BY THE

Hon'ble R. C. Dutt, I. C. S, C. I. E.

1. **Ramayana** —*English Translation.* } *With Copperplate illustrations.*
2. **Mahabharata** — " }
3. **Famines in India.**
4. **Civilization in Ancient India**, Revised Edition, 2 vols, (Trübner's Oriental Series), Kegan Paul & Co., London, 21*s*.
5. **Lays of Ancient India**, Selections from Indian Poetry rendered into English Verse. (Trübner's Oriental Series) Kegan Paul & Co., London, *7s.6d.*
6. **A Brief History of Ancient & Modern India**, Entrance Course for 1894, 1895, 1896, cloth Rs. 1-10, paper Rs. 1-8.
7. **A Brief History of Ancient & Modern Bengal**, cloth Ans. 12, half cloth Ans. 10.
8. **The Peasantry of Bengal**, Revised Edition, *In preparation.*
9. **The Literature of Bengal**, Rs. 3.
10. **Rambles in India**, Rs. 2.
11. **Three Years in Europe**, 1868 to 1871 with accounts of visits to Europe in 1886 and 1893, Rs. 3

মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত বা প্রকাশিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহ।

১। ঋগ্বেদ-সংহিতা, মূল সংস্কৃতে প্রকাশিত ... ৩৲

ঐ ঐ বঙ্গ অনুবাদ ... ... ৭৲

২। হিন্দুশাস্ত্র, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনূদিত।

প্রথম ভাগ, বেদসংহিতা ... . ১৲

দ্বিতীয় ভাগ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ... ১৲

তৃতীয় ভাগ, শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্র ... ... ১৲

চতুর্থ ভাগ, ধর্ম্মসংহিতা ... ... ১৲

পঞ্চম ভাগ, ষড়্‌দর্শন ... ... ১৲

উপরিউক্ত পাঁচ ভাগ একত্রে বাঁধাই ৫৲

ষষ্ঠ ভাগ, রামায়ণ ... ... ১৲

সপ্তম ভাগ, মাহাভারত ... ... ১৲

অষ্টম ভাগ, অষ্টাদশ পুরাণ ... ... ১৲

নবম ভাগ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ... ... ২৲

উপরিউক্ত চারি ভাগ একত্রে বাঁধাই ৫৲

৩। বঙ্গবিজেতা, কাপড়ে বাঁধাই ১৷৷৹

৪। রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, ঐ ১৷৷৹

৫। মাধবী-কঙ্কণ, (যমুনায় বিসর্জ্জন), ঐ ১৷৷৹

৬। মহারাষ্ট্র-জীবন প্রভাত, ঐ ১৷৷৹

৭। সংসার, ঐ ১৷৷৹

৮। সমাজ ঐ ১৷৷৹